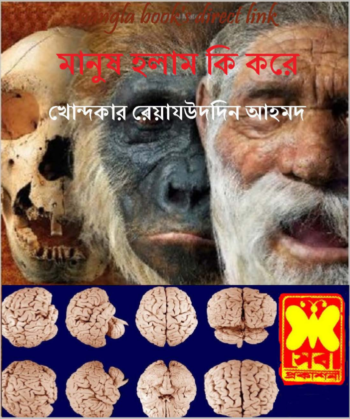

মানুষ হলাম কি করে
খোন্দকার রেয়াযউদদিন আহমদ

মানুষ হলাম কি করে

খোন্দকার রেয়াযউদদিন আহমদ

সুন্দর, সাবলীল বাংলায় ছোটবড় সবার জন্য
সৃষ্টি-রহস্যের এক মূল্যবান বিজ্ঞান-ভিত্তিক গ্রন্থ
সেই আদিকাল থেকে জীবজগতের
ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে কিভাবে এল মানুষ ?
কেমন করে হাজার হাজার বছর ধরে রূপান্তরিত
হয়ে ধাপের পর ধাপ ডিঙিয়ে আজকের স্তরে পৌঁছেছে ?
সঠিক চিন্তার পথে এই জ্ঞান আপনাকে বিশেষ সাহায্য করবে
ছেলেমেয়েদের জন্য একটি অপরিহার্য বই।

মানুষ হলাম কি করে

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই, প্রিয় বই : অবসরের সঙ্গী
মূল্য : আট টাকা

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৮০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :মোঃ মহিদুল ইসলাম নোমান(:p)

মুদ্রণে :
মো: শাহজাহান আলী
শরীফ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১৬, আহ্‌সান উল্লা রোড, নবাব বাড়ি,
ঢাকা-১

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২
দুরালাপনী : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

MANUSH HOLAM KI KOREY
By Khondker Reazuddin Ahmed

ভূমিকা

আমি বিজ্ঞানী নই।

তবু দুরূহ সাহস করে মানুষের ইতিহাস তথা প্রথম প্রাণের জন্ম, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর কিছুটা ঠিকানা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

অবশ্য এতে আমার কৃতিত্ব বিশেষ কিছুই নেই।

অন্যান্য বিজ্ঞানীদের অনুসরণ করেছি মাত্র।

অতএব তাঁদের সবার নিকট আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

এদেশের পাঠক-পাঠিকাদেরকে সর্বাঙ্গ সুন্দর একটি গ্রন্থ উপহার দেবার চেষ্টার ত্রুটি করিনি, তবু হয়ত ভুলভ্রান্তি রয়ে গেছে। কোথাও অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হলে দয়া করে নিম্ন ঠিকানায় জানালে বাধিত হবো।

বিনীত—

খোন্দকার রেয়াযউদ্দিন আহমদ
২১২, মোগলটুলী সড়ক
কুমিল্লা।

এই বই লিখতে সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ—

১। পৃথিবীর ঠিকানা—অমল দাশগুপ্ত
২। Biography of the Earth—George Gamow
৩। Man in Search of his Ancestors—Andre Sen t..
৪। চার পা থেকে দু'পা—বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়।
৫। মানুষের ঠিকানা—অমল দাশগুপ্ত।

সূচীপত্র

প্রথম প্রাণের আবির্ভাব

বানর থেকে মানুষ

প্রথম প্রাণের আবির্ভাব

উদ্ভিদ থেকে জীবজন্তু

১

বিভিন্ন ধর্ম মতে প্রাণের জন্ম

আমরা মানুষ।

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ অবদান আমরা।

আজ আমরা আকাশ দিয়ে উড়ে চলি। জলের উপর বড়ঃ বড় জাহাজ ভাসিয়ে এদেশ থেকে ওদেশে—এক কালের অজেয় সমুদ্রের এ-পার থেকে ও-পারে যাই।

মাটির তলা দিয়ে রেলপথ তৈরি করে চলে আমাদের দুঃসাহসিক অভিযান। যে হিমালয় চির অবিজেয় বলে এক-

কালের মানুষের ধারণা ছিলো, তাই আজ মানুষের নিকট পরাজিত।

উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সব খুঁটিনাটি সংবাদও আজ আমাদের নখদর্পণে।

আমরা বিজয়ী।

আমরা সভ্যতার শেষ ধাপের বাসিন্দা।

আমরা জয় করেছি প্রকৃতিকে।

আমরা জয় করেছি নিজেকে।

জয় করেছি পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থাকে।

আর পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জয় করে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়া মানেই মানুষের অমরত্ব ঘোষণা করা।

তাই মানুষের বংশকে লোপ করে দেয়া আজ প্রকৃতির পক্ষে আগের মত সহজ নয়।

কিন্তু মানুষের এমন একটা সময় ছিলো যখন সে ছিলো প্রকৃতির বুকে আর আর জীব জন্তুর মতই অসহায়।

প্রতি পদে ছিলো তার মৃত্যুর আশংকা।

অসম্ভব সাহস আর সংগ্রাম তাকে সেদিন বাঁচিয়েছিলো।

আমরা মানুষ।

প্রকৃতির শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ জীব আমরা।

কিন্তু আমাদের মনে একটা প্রশ্ন সব সময়ই থেকে যাচ্ছে।

মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি আর বিদ্যার বিকাশের পর থেকেই ভাবছি, আমরা হলাম কি করে?

কেন হলাম ?

কবে হলাম ?

এ প্রশ্ন মানুষের মনে উঠেছে।

এবং মানুষ যে তার একটা সমাধানও খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছে তা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মীয় বই পুস্তকগুলিতে খুঁজলেই পাওয়া যাবে।

ইসলাম ধর্ম বলে, পৃথিবীর প্রথম মানব মানবী হলো হযরত আদম ও বিবি হাওয়া।

আল্লাহ্তালা প্রথম হযরত আদমকে সৃষ্টি করে বেহেস্তে স্থান দেন। তারপর তাঁরই অস্থি থেকে দুনিয়ার প্রথম নারী বিবি হাওয়াকে তৈরি করেন।

সুখেই তাঁদের দিন কেটে যাচ্ছিলো বেহেস্তে।

কিন্তু বাদ সাধলো শয়তান।

কারণ তাঁরই জন্য ফেরেস্তাদের সর্দার ইবলিশ পরিণত হয়েছিলো শয়তানে।

আল্লাহ্তালার প্রিয় সৃষ্টি মাটির তৈরি হযরত আদমকে সেজ্‌দা না করে তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছিলো সে।

শয়তান লাগলো হযরত আদমের পেছনে।

কি করে তাঁর সর্বনাশ করা যায় ?

একদিন ছলনার আশ্রয়ে বিবি হাওয়াকে দিয়ে নিষিদ্ধ ফল 'গন্ধম' খাইয়ে দেয়া হলো হযরত আদমকে।

নিজের অজান্তেই আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করলেন তিনি।

বেহেস্তে আর তাঁদের স্থান নেই।

পাঠিয়ে দেয়া হলো ছুনিয়ায়।

পৃথিবীর প্রথম মানব মানবী।

তাঁদেরই বংশধর আজকের ছুনিয়ার সব মানব মানবী।

ছু'জন থেকে চার জন।

চার থেকে আট।

এভাবেই বেড়েছে মানুষের সংখ্যা।

খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে বলা হয়েছে, আজকের দিনে যত রকমের জীবকে আমরা এই পৃথিবীতে চলাফেরা করতে দেখি, তাদের আদি জোড়াটি ঠিক আজকের মত আকারেই সৃষ্টির প্রথমে ঈশ্বরের ইচ্ছায় তৈরি হয়েছিল, মানুষও এ-ভাবেই পূর্ব থেকে তৈরি হয়ে বেহেস্তের গুদামে মওজুদ ছিলো।

তারপর একদিন ঈশ্বরের ইচ্ছায় একজোড়া মানব-মানবী অর্থাৎ আদম ও ঈভকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। তাঁদের বংশধরই আজকের ছুনিয়ার লক্ষ কোটি মানুষ।

হিন্দু ধর্মের মতে পৃথিবীর আদি মানব মনু।

ঈশ্বর মানব রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন।

তারপর মনুষ্য বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়ে সরে পড়েন।

বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন মত।

কিন্তু বিজ্ঞানীদের কথা সম্পূর্ণ অন্য রকম।

তাঁদের মতে প্রাণের জন্ম হয়েছিলো পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে।

প্রাণের জন্ম আর মানুষের জন্ম হওয়া এক কথা নয়।

মানুষের জন্ম তো পৃথিবীর কাছে সেদিনের ঘটনা।

তবে মানুষের সৃষ্টিরহস্য জানতে হলে আমাদের আগেই জানতে হবে, কি করে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হলো।

কারণ ওই প্রথম প্রাণের পরিবর্তনের আধুনিক সংস্করণই হলো আজকের দুনিয়ার সভ্য মানুষ। আকাশ জয়ী মানুষ। মানুষ আজ লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চন্দ্রপৃষ্ঠেও পায়ের চিহ্ন রেখে এসেছে। মানুষের ইতিহাসে এটা স্মরণীয় ঘটনা।

প্রথম
প্রাণের জননী

আজ থেকে প্রায় দেড়শো কোটি বছর আগের কথা।

পৃথিবীর সেই আদিম যুগে ভূ-পৃষ্ঠের সেই আদিম সমুদ্রে জেলির মত তুলতুলে নরম এক ধরনের আদিম জীব কোটি

কোটি বছর ধরে আদিম অন্ধ জীবন যাপন করেছে।

এদের শরীরে হাড়ের চিহ্নমাত্র ছিলো না।

তবে প্রশ্ন হতে পারে সমুদ্রেই বা প্রাণের জন্ম হলো কেন?

আমরা জানি, ফুটন্ত জলের উত্তাপে কোন জীবাণুই বাঁচতে পারে না।

তাই পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিকে কোন জীবাণুর পক্ষে জন্মগ্রহণ করা সম্ভব নয়। সে-সময়ে ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ ফুটন্ত জলের কাছাকাছি তো বটেই বরং তার চাইতেও বেশি ছিলো। এ সময়ে পৃথিবীর সমস্ত পানি বাষ্প হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এক বিন্দু পানি কোথাও নেই। উত্তপ্ত ভূ-পৃষ্ঠ টগবগ করে ফুটছে যেন।

এ অবস্থাতে প্রাণ ধারণের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ ক্রমে অনেক কমেছে।

অনেক শীতল হয়ে উঠেছে।

এ সময়ে পৃথিবীর সমস্ত বাষ্প পানি হয়ে ঝরে পড়তে আরম্ভ করলো।

তৈরি হলো সমুদ্র-মহাসমুদ্র।

পৃথিবীর আদিম সমুদ্র।

তখনই শুধুমাত্র প্রাণের জন্ম হওয়া সম্ভব হলো।

তাই পৃথিবীর আদিম সমুদ্রই হচ্ছে প্রাণের জননী ও ধাত্রী।

প্রাণের আবির্ভাব

দেখা যাচ্ছে, গ্রহের বিবর্তনের বিশেষ এক পর্যায়ে যখন নাকি প্রাণ ধারণের উপযোগী পরিবেশ তৈরি হয়, একমাত্র তখনই সেই গ্রহে প্রাণের জন্ম হওয়া সম্ভব।

তার আগে কিছুতেই নয়।

তাই ভূ-পৃষ্ঠের আদিম সমুদ্রই ছিলো প্রাণ ধারণের পক্ষে প্রথম উপযোগী।

কিন্তু কি করে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হলো?

আমরা জানি এবং চোখেই দেখছি, জীব থেকেই জীবের জন্ম।

কথাটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

জীব জগতের একটি সাধারণ লক্ষণ—বংশ রক্ষা।

পশু-পাখী, গাছ-পালা সর্ব ক্ষেত্রেই এই লক্ষণ পরিস্ফুট।

কোন বিশেষ জাতের জীব সেই বিশেষ জাতের সন্তানই প্রসব করে।

মানুষের জন্ম মানুষ থেকে।

পশুর জন্ম পশু থেকে।

গাছ-পালার জন্ম গাছ-পালা থেকে।

এ ব্যাপারটি আমাদের চোখের সামনেই নিয়ত ঘটছে।

ঘটবে।

আমাদের প্রশ্ন হলো, জীব জগতের শুরু হয়েছিলো কি ভাবে?

কোন্ আশ্চর্য ঘটনার যোগাযোগে ভূ-পৃষ্ঠে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হয়েছিলো?

নিষ্প্রাণ বস্তু জগতে প্রাণের স্ফুলিংগ এসেছিলো কোথা থেকে?

কেনই বা এসেছিলো?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে প্রথমে আমাদের জৈব পদার্থ সম্পর্কে কিছুটা জানা দরকার।

জৈব পদার্থ ও তার প্রথম আবির্ভাব

উদ্ভিদ ও জীবদেহ যে পদার্থে তৈরি তাকে বলা হয় জৈব পদার্থ।

এর বৈশিষ্ট্যসূচক মৌলিক উপাদান হচ্ছে কার্বন।

জৈব পদার্থকে আংশিকভাবে পোড়ালে পাওয়া যায় অংগার। পুরোপুরি পোড়ালে পাওয়া যায় ছাই। কিন্তু কোন অজৈব পদার্থকে, যেমন এক টুকরো পাথর বা কাঁচ যতই পোড়ানো যাক না কেন, কিছুতেই অংগার পাওয়া যাবে না।

কাজেই কোন জৈব পদার্থের বিন্যাস যত বিচিত্র বা জটিলই হোক না কেন, তার মাঝখানে খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মাত্র মৌলিক পদার্থ। তা হলো কার্বন।

প্রাণের জন্ম হতে হলে জৈব পদার্থের অস্তিত্ব থাকা দরকার।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমাদের এই পৃথিবীতে প্রথম কি ভাবে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিলো ?

পৃথিবীর যত জৈব পদার্থ তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে তার জন্ম কোন না কোন জৈব প্রক্রিয়ার ফলেই। যেমন গাছ থেকে গাছ, মানুষ থেকে মানুষ ইত্যাদি।

নিশ্চয় পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটা সময় ছিলো যখন উদ্ভিদ বা জীবের অস্তিত্ব ছিলো না।

থাকা সম্ভবও নয়।

বিজ্ঞানীরা আজ সবাই একবাক্যে স্বীকার করছেন পৃথিবী নামক গ্রহটা অন্যান্য গ্রহদের মত সূর্যেরই একটা অংশ। অন্য কোন বিরাট গ্রহ বা ধূমকেতুর আকর্ষণে এক সময়

সূর্য থেকে ছিটকে বের হয়ে আসে।

কিন্তু সূর্যের আকর্ষণ বা চুম্বক শক্তির বাইরে যেতে পারে না। ফলে সূর্যকে ঘিরে শুরু হয় তার আবর্তন।

পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহদের অবস্থা তখন ছিলো এক একটা জ্বলন্ত অগ্নি পিণ্ডের মত।

ক্রমে তা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে থাকে।

বাষ্প হয়ে আকাশে জমে থাকা পানি এক সময় ঝরে পড়ে পৃথিবীর মাটির উপর।

সৃষ্টি হয় সমুদ্র, মহাসমুদ্র।

এ সময়ে প্রথম জৈব প্রক্রিয়া ছাড়াই জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে।

কিন্তু কিভাবে তা তৈরি হয়েছিলো?

এমন একটা আশ্চর্য ঘটনা কিভাবে সম্ভব হলো?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের জানতে হবে জৈব পদার্থ কি কি উপাদানে তৈরি।

উত্তাপের তারতম্য হেতু নক্ষত্রকে নানা জাতে ভাগ করা হয়েছে। কোন কোন নক্ষত্রে উত্তাপ বেশি। কোন কোন নক্ষত্রে খুবই কম।

তাই বলে প্রমাণ হয় না যে, সব নক্ষত্রেই উদ্ভিদ বা জীবের অস্তিত্ব সম্ভব।

স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন নক্ষত্রের উপাদান বিশ্লেষণ করে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে।

খুব বেশি উত্তপ্ত নক্ষত্রে কার্বন পরমাণু একেবারে ছাড়া-ছাড়া ভাবে গা ভাসিয়ে বেড়ায়।

অন্য কোন পরমাণুর ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আসে না।

কিন্তু যে সব নক্ষত্রের উত্তাপ ১২,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি, সেখানে দেখা যায় কার্বন ও হাইড্রোজেন মিলে তৈরি হয়েছে হাইড্রোকার্বন।

নক্ষত্রের উত্তাপ যত কমে, হাইড্রোকার্বনের অস্তিত্বও ততো প্রকট হয়ে ওঠে।

আমাদের সূর্যের বাইরের দিকের উত্তাপ ৫,৮০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে ৬,৩০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে।

এখানে দেখা যায়, কার্বনের সঙ্গে একাধিক মৌলিক পদার্থের মিলন ঘটেছে। যেমন কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের, কার্বনের সঙ্গে নাইট্রোজেনের। এমন কি কার্বনের সঙ্গে কার্বনের।

বৃহস্পতি গ্রহের বায়ুমণ্ডলে প্রধানতঃ পাওয়া যায় অ্যামোনিয়া ও মিথেল—এই দু'জাতের হাইড্রোকার্বন।

অন্যান্য জাতের হাইড্রোকার্বনও নিশ্চয়ই আছে।

বৃহস্পতি গ্রহের উত্তাপ এত কম যে, সে সব হাইড্রোকার্বনের পক্ষে তরল বা কঠিন অবস্থায় ছাড়া থাকা সম্ভব নয়।

যে সমস্ত উল্কাপিণ্ড শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মাটিতে এসে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গেও কার্বনের মিলন

ঘটতে পারে।

কার্বন ও হাইড্রোজেনের মিলনের ফলে যেমন হাইড্রো-কার্বন, তেমনি কার্বন ও ধাতুর মিলনের ফলে কার্বাইড।

এভাবে নক্ষত্র ও উল্কাপিণ্ডকে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ পাওয়া গেলো যে, জীবের অস্তিত্ব ছাড়াও হাইড্রোকার্বনের অস্তিত্ব সম্ভব। অর্থাৎ জৈব প্রক্রিয়া ছাড়াও জৈব পদার্থ তৈরি হতে পারে।

অন্যত্র যা সম্ভব। পৃথিবীতেই বা তা অসম্ভব হবে কেন?

বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে একমত যে, উল্কাপিণ্ড যেসব উপাদানে তৈরি, আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তরেও সেই একই ধরনের উপাদান রয়েছে।

ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি নানা কারণে এই বস্তুপিণ্ড গলিত অবস্থায় পৃথিবীর মাটি ফুঁড়ে বাইরে চলে আসে।

এক সময়ে যখন পৃথিবী আরো উত্তপ্ত অবস্থায় ছিলো, তখন পৃথিবীর সমস্ত পানি বাষ্পের আকারে বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়াতো।

সে সময়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরের গলিত বস্তুপিণ্ড ছিটকে আছড়ে পড়তো ভাসমান বাষ্পের স্তূপে।

বস্তুপিণ্ডের মধ্যে ছিলো কার্বাইড আর বাষ্পে ছিলো হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন।

এতগুলো পদার্থের হুটোপুটির মধ্যে থেকে কার্বাইডের কার্বন আর বাষ্পের হইড্রোজেন হাত ধরাধরি করে বের

হয়ে এসেছিলো।

এভাবেই আমাদের এ পৃথিবীতে হাইড্রোকার্বনের জন্ম। তথা জৈব পদার্থের আবির্ভাব।

প্রোটোপ্লাজম ও জীবদেহ

প্রোটোপ্লাজম নামে এক বিশেষ ধরনের উপাদানে জীব দেহ গড়ে ওঠে। প্রোটোপ্লাজমের মুখ্য উপাদান হলো প্রোটিন।

আর এই প্রোটিন তৈরি হয় হাজার হাজার কার্বন-হাইড্রোজেন-অক্সিজেন-নাইট্রোজেন পরমাণুর সুবিন্যস্ত সংযোগে।

পৃথিবীর আদিম সমুদ্রেও প্রোটিন তৈরি হওয়ার পক্ষে অনুকূল অবস্থা বজায় ছিলো।

লক্ষ লক্ষ বছর ধরে হাইড্রোকার্বনের নানা রূপান্তর ঘটে তৈরি হয় প্রোটিন ও অসংখ্য রকমের জৈব পদার্থ।

কিন্তু জৈব পদার্থ তৈরি হওয়া মানেই তো আর জীব

তৈরি হওয়া নয়।

যতক্ষণ না তাতে জীবন সঞ্চারিত হচ্ছে ততক্ষণ জীবের জন্ম কিছুতেই সম্ভব নয়। আজকের বিজ্ঞানাগারে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থ (যেমন, শর্করা, গন্ধক দ্রব্য, স্নেহ পদার্থ, নীল, গাছপালার রং ইত্যাদি) তৈরি সম্ভব হলেও এর প্রাণ দেয়া সম্ভব নয়, যত ভাবেই একে রূপান্তরিত করা হোক না কেন।

নির্জীব জৈব পদার্থে হাজার রকম অদলবদল ঘটলেও কিছু যায় আসে না, যতক্ষণ না একটা বিশেষ আঁটঘাট বেঁধে দাঁড়াতে পারে, যাতে তাতে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পরমুহূর্ত হতে তাকে আর নির্জীব বলা চলে না। হয়ে ওঠে সজীব।

আর জীবনের প্রধান লক্ষণ হলো, পুষ্টি ও বংশ রক্ষা।

অতএব আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো, জৈব পদার্থের মধ্যে একটা বাঁধুনি সম্ভব কি না, যার ফলে সেই পদার্থটির পুষ্টি ও বংশ রক্ষা হতে পারে। তা যদি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি, নির্জীব পদার্থটি সজীব পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে।

কি ভাবে তা সম্ভব ?

আমরা জানি, জীবনের মূল উপাদান হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম। আর এর মুখ্য উপাদান হচ্ছে প্রোটিন।

কলয়ডাল সলিউশন

প্রোটিন ছাড়াও আরো অনেকগুলো জৈব ও অজৈব পদার্থ রয়েছে। সব মিলিয়ে অত্যন্ত জটিল একটি বিন্যাস।

এই পদার্থগুলো আছে জলে গোলা অবস্থায় বা দ্রবীভূত অবস্থায়। এজন্যে ইংরেজীতে একে বলা হয় সলিউশন।

লবণ গোলা জলকেও সলিউশন বলা হয়।

প্রোটোপ্লাজম কিন্তু এক বিশেষ ধরনের সলিউশন। ইংরেজীতে একে বলা হয়—কলয়ডাল সলিউশন।

চিনি বা লবণ গোলা জল খুব মিহি ছাঁকুনির ভেতর দিয়ে অনায়াসেই বেরিয়ে আসে। ছাঁকার পরও লবণ বা চিনি জলে থেকেই যায়। অর্থাৎ চিনি বা লবণ জলের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গেছে যে, শুধু ছেঁকে চিনি বা লবণকে সেই জল থেকে আলাদা করা যায় না।

কিন্তু বিশেষ এক ধরনের গঁদের আটা আছে যা, জলে গুলিয়ে নিলে চোখের দেখায় মনে হয় জলের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে।

আসলে তা নয়।

খুব মিহি ছাঁকুনি দিয়ে ছাঁকতে গেলেই তা আটকে যায়।

আবার কাদা গোলা জল ঘোলাটে থাকে।

কারণ কাদা ও জল মিশ খায় না।

তবে চিরকালই তা ঘোলাটে থাকে না। আস্তে আস্তে ঘোলাটে জলের সমস্ত কাদা থিতিয়ে পড়ে। জল হয়ে ওঠে পরিষ্কার টলটলে। অর্থাৎ যা কিছু জলের সঙ্গে মিশ খায় না তার থিতিয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক।

কলয়ডাল সলিউশনের কিন্তু একটা বিশেষ গুণ রয়েছে। যদিও এটা জলের সঙ্গে পুরোপুরি মিশ খায়নি (কারণ, তা মিহি ছাঁকুনিতে আটকে যায়) তবুও তা থিতিয়ে পড়ে না।

অর্থাৎ, দ্রবীভবনও নেই।

থিতিয়ে পড়াও নেই।

কলয়ডাল সলিউশন জৈব পদার্থেরও হতে পারে, অজৈব পদার্থেরও হতে পারে। অজৈব পদার্থের কলয়ডাল সলিউশন সহজেই স্বধর্মচ্যুত হয়ে থিতিয়ে পড়ে।

জৈব পদার্থের কলয়ডাল সলিউশন এমন একটা আঁটঘাট বেঁধে থাকতে পারে, যা সহজে ভেঙে পড়ে না।

যেমনটি থাকার থেকে যায়।

তাছাড়া এর আর একটা বিশেষ গুণ হলো পানির সঙ্গে অন্য যে সব জৈব ও অজৈব পদার্থ মিশে থাকে সে-গুলোকে সহজেই আত্মসাৎ করে নিতে পারে।

পরের জিনিস আত্মসাৎ করলে স্বাভাবিক নিয়মেই 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' হতে হয়।

কলয়ডাল জৈব পদার্থটিও সে-অবস্থা থেকে রেহাই পায় না, আত্মসাতের পালা যতই চলতে থাকে ততই ফুলতে শুরু করে। ক্রমে তার চেহারা হয়ে ওঠে অনেকটা জেলির মত। ছাই ছাই রঙা।

সেই অবস্থায় জৈব পদার্থটি ভাসতে থাকে পৃথিবীর সেই আদিম সমুদ্রে।

দিন দিন আয়তনে ও ওজনে বাড়তে থাকে।

আভ্যন্তরীণ দিক থেকে হয়ে ওঠে জটিলতর।

এভাবে কেটে যায় লক্ষ লক্ষ বছর।

ওদিকে আত্মসাতের পালা থামেনি।

চলতে থাকে।

অসংখ্য রকমের জৈব পদার্থ, প্রোটিন ও অজৈব পদার্থের সঙ্গে চলছে অসংখ্য রকমের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া।

শেষ পর্যন্ত সাধ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

ফেটে দু'টুকরো হয়ে যায় কলয়ডাল জৈব পদার্থটি। অর্থাৎ আগে ছিলো একটি ; এখন হলো দুটি।

আবার এই টুকরো দুটোও 'বাপকা বেটা'।

তারাও আলাদা আলাদা ভাবে পানির ভাণ্ডার থেকে আত্মসাৎ করে চলে।

এবং আলাদা আলাদা ভাবে জন্মদাতার মতই আয়তনে ও

ওজনে বাড়তে থাকে।

টুকরো দুটোর আরো সুবিধে হলো পরিবেশের সঙ্গে তারা আগে থেকেই পরিচিত। আত্মসাতের ব্যাপারে আগে থাকতেই অভ্যস্ত।

সেপাই-এর ছেলে যেমন পেট থেকে পড়েই লড়তে শেখে, প্রোটোপ্লাজমের 'বাচ্চা দু'টো'ও 'বাপের স্বভাব' নিয়েই জন্মায়।

জীবনের জয়ধ্বনি এলো দ্বারে

কলয়ডাল পদার্থটির মধ্যে জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুটো লক্ষণই প্রকাশ পেয়ে গেছে।

একটি হলো পুষ্টি।

অপরটি হলো বংশ রক্ষা।

এই বিশেষ ধরনের কলয়ডাল জৈব পদার্থটির নাম প্রোটোপ্লাজম।

প্রাণের দুর্বার অভিযান একদা এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রোটোপ্লাজম বিন্দুকে আশ্রয় করেই শুরু হয়েছিলো। কালক্রমে তা বিচিত্র শাখা প্রশাখায় বহু ব্যাপ্ত।

স্ফুলিংগের একটি কণিকা লক্ষ শিখায় বহ্নিমান।

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে প্রোটোপ্লাজম তৈরি হতে পেরেছিলো সূর্যের আলোর আশীর্বাদে।

বায়ুমণ্ডলে তখনো অক্সিজেন তৈরি হয়নি।

ফলে সূর্যের আলোর আলট্রাভায়োলেট রশ্মির অবাধ যাতায়াত ছিলো।

এবং তা এসে ছুঁয়েছিলো সমুদ্রের পানিকে।

'সোনার কাঠি'র ছোঁয়ার মত সেই আলট্রাভায়োলেট রশ্মির ছোঁয়ায় সমুদ্রের পানি আর জৈব পদার্থ মিলিয়ে তৈরি হয়েছিলো প্রোটোপ্লাজম।

আর সেই প্রোটোপ্লাজমের একটি বিন্দু তৈরি হতে সময় লেগেছে কোটি কোটি বছর।

প্রক্রিয়াটি এত ধীরে ধীরে কার্যকরী হয় যে, এই প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়াটা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

তাই, আজও সমুদ্রের পানিতে এই প্রোটোপ্লাজম তৈরি হচ্ছে কিনা সে-সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু বলার মত জ্ঞান মানুষের

এখনো হয়নি। মোটামুটি এটুকু বলা চলে যে, আজকের দিনে যেখানে যতো উদ্ভিদ ও জীব আমরা দেখি তা সবই বিবর্তনের অনেকগুলো ধাপ পার হয়ে এসেছে। সবাই যে টিকে গেছে তা নয়। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে মধ্যযুগের অমিত বিক্রম সরীসৃপের দল ভূ-পৃষ্ঠ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

অথচ তাদের চাইতে অনেক ক্ষীণকায় ও স্বল্পতেজ স্তন্যপায়ীরা শুধু যে টিকে আছে তা নয়, সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে আধিপত্য করছে।

পরিবর্তমান পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাই ভূ-পৃষ্ঠের প্রত্যেকটি উদ্ভিদ ও জীবকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কতগুলো বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হয়েছে। নইলে কোনটিই টিকে থাকতে পারতো কিনা সন্দেহ।

উদ্ভিদ ও জীব জগতের বিবর্তন যে সম্ভব হয়েছে তা শুধু এ কারণেই।

একেক যুগে যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে, পরের যুগে সেখান থেকেই শুরু।

বারে বারে নতুন করে শুরু করতে হয় না।

তাই, আজকের দিনেও পৃথিবীর সমুদ্রে সেই আদিম যুগের প্রতিক্রিয়ায় যদি প্রোটোপ্লাজমের একটি বিন্দু তৈরি হয়েও যায়, তাহলেও বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য বর্জিত সেই প্রাণ বিন্দুটির কোন ভবিষ্যৎ নেই।

কারণ, ইতিমধ্যেই জীবনের প্রকাশ অনেক—অনেক উঁচু স্তরে অধিষ্ঠিত।

আদিম একটি প্রাণবিন্দুর পক্ষে কোনক্রমেই এই উচ্চতর জীবনের সঙ্গে পাল্লা দেয়া সম্ভব নয়।

প্রাণের জন্ম যেমন এক আশ্চর্য ঘটনা, প্রাণের বিবর্তনও তাই।

আজ থেকে একশো কোটি বছর আগের সময়ে উপস্থিত হলে আমরা কি দেখবো?

দেখবো চারিদিকে শ্যামলতার ছিটেফোঁটাও কোথাও নেই।

অরণ্যহীন।

তৃণহীন।

রুক্ষ ও অনুর্বর জমি, খোসা ওঠা ঘায়ের মত দগদগে।

মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করছে।

নিস্তব্ধ।

কোথাও প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই।

কিন্তু সত্যই কি তাই?

না।

আসলে তখনি সমুদ্রের পানিতে ছোট ছোট বিন্দুর মত জীবাণুরা গায়ে গায়ে মিশে থেকে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রাণান্তকর সংগ্রামে রত হয়েছে।

সমুদ্রের শান্ত পানি তখনো বাষ্প হয়ে আকাশে ওঠেনি।

বৃষ্টি হয়েও ঝরে পড়েনি।

সূর্যের আলোর পথ আটকে বাষ্পের ঘন মেঘ আগে থেকেই বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

বাতাসে অক্সিজেন নেই।

বেশির ভাগই কার্বনডাই অক্সাইড।

পৃথিবীর এই পরিবেশ প্রাণ ধারণের পক্ষে উপযোগী নয়।

তবু প্রাণের অস্তিত্ব বজায় ছিলো।

শুরু হয়েছিলো জীবনের সংগ্রাম।

টিকে থাকার সংগ্রাম।

বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

তখন জীবাণুরা দু'ভাগে পুষ্টি সংগ্রহ করতো।

একদল জীবাণু সমুদ্রের জলের জৈব পদার্থকেই তাদের পুষ্টি সংগ্রহের ভঁাড়ার করে তুলেছিলো।

অন্যদল সমুদ্র জলের গন্ধক, লোহা ইত্যাদি অজৈব পদার্থের উপরই নির্ভর করেছিলো। ভূ-পৃষ্ঠের অধিকাংশ লোহার খনি এই জীবাণু দলেরই দেহাবশেষ মাত্র।

তারপর ক্রমে পৃথিবী শীতল হতে আরম্ভ করে।

বৃষ্টি ঝরে ঝরে পানি জমতে থাকে সমুদ্রে।

বাষ্পের মেঘ পাতলা হয়ে সূর্যের আলো সোজাসুজি পৃথিবীর বুকে এসে পড়ে।

এতদিন ঘন বাষ্পের মেঘ চুঁইয়ে সূর্যের আলো ভূ-পৃষ্ঠে এসে পড়তো।

জীবাণুদের পুষ্টি সংগ্রহের ব্যাপারে সেই কৃপণ আলো সহায়তা করেনি। জীবাণুরা পুষ্টি সংগ্রহ করেছিল শুধুমাত্র সমুদ্রের পানি থেকে। এবার সূর্যের আলো নাগালের মধ্যে এসে যেতেই হাওয়া থেকে পুষ্টি সংগ্রহের একটা উপায় জানা গেলো। ফলে সূর্যের আলোর প্রভাবে একদল জীবাণুর দেহে তৈরি হলো ক্লোরোফিল নামে একটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। এই পদার্থ গাছের পাতার সবুজ অংশে রয়েছে।

এই ক্লোরোফিলের একটা বিশেষ গুণ হলো সূর্যের আলোর সাহায্যে এই পদার্থ বাতাসের কার্বন-ডাই অক্সাইডকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলে।

এক ভাগে থাকে কার্বন।

অপর ভাগে অক্সিজেন।

কার্বনের ভাগটি হয় গাছের পুষ্টি।

অক্সিজেনের ভাগ বাতাসে মিশে যায়।

উদ্ভিদ

যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি, তখনো বাতাসের প্রায় সবটাই কার্বন-ডাই-অক্সাইড।

অক্সিজেন নেই।

সুতরাং ক্লোরোফিল পদার্থটি এক বিশেষ দলের জীবাণু দেহে তৈরি হয়ে যাবার পর সেই দলটি পরমানন্দে শুধু হাওয়া খেয়েই বেঁচে থাকতে পারলো।

পুষ্টি হচ্ছে কার্বন সংগ্রহেরই নামান্তর।

কাজটা যত শক্ত ছিলো, ক্লোরোফিল তৈরি হয়ে যাওয়ার পর ততই সহজ হয়ে গেলো।

আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে অজস্র সূর্যের আলো।

বাতাসে রয়েছে অজস্র কার্বনডাই-অক্সাইড।

জীবাণু দেহে রয়েছে ক্লোরোফিল।

সুতরাং অঢেল কার্বনের যোগান আসতে লাগলো।

হু হু করে বাড়তে লাগলো জীবাণুদের শরীর।

আর অতিরিক্ত গুরুভোজের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ঘটতে লাগলো নানা অদলবদল।

এমনি এক বাড় বাড়ন্ত অবস্থার মধ্যে জীবন কাটিয়ে নানা অদলবদলের মধ্য দিয়ে এসে, এই জীবাণু দলের চেহারা শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে, তার নাম দিয়েছি আমরা উদ্ভিদ।

ক্লোরোফিল তৈরি হবার পর একশো কোটি বছরও পার হয়নি। অথচ এরই মধ্যে উদ্ভিদ জগতটি নানা শাখা প্রশাখায় কী বিচিত্রই না হয়ে উঠেছে।

ফুলে ফলে অপরূপ।

মনোরম।

এর নয়নাভিরাম দৃশ্য ব্যতীত প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমই জমে ওঠে না।

সৃষ্টি হয় না কবির কাব্য।

লেখক পায় না তার কল্পনার খোরাক।

আদিম জীবের জয়যাত্রা শুরু

জীবাণু দলের আর একটি শাখা ক্লোরোফিলের ধার ধারতো না।

এদের বলা চলে পরান্নভোজী। অর্থাৎ অপরে চেষ্টা চরিত্র করে কার্বন সংগ্রহ করুক, আমরা একেবারে তৈরি

খাবারে ভাগ বসাই।

গাছের একটা পাতা একদানা কার্বন সংগ্রহ করে অনেক মেহনতের পর। পরান্নজীবীরা গাছের পাতার কার্বনটুকুই আত্মসাৎ করে বসে।

তবে তাদের বড় অসুবিধা হলো তৈরি খাবার কোন দিনও মুখের কাছে এসে হাজির হয় না। তার সন্ধানে আদাড়ে পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হয়।

কাজেই এই পরান্নভোজী জীবাণুর দলকেও কিছুটা মেহনত করতে হয়েছিলো। এই মেহনতের ফল হিসেবে নড়েচড়ে বেড়াবার একটা ক্ষমতা তারা আয়ত্ত করে ফেলে।

স্বল্প মেহনতে খাদ্যবস্তু নাগালের মধ্যে পেয়ে তাদের দলের লোভ বেড়ে যায়।

এখন আর শুধু গাছের পাতা খেয়েই সন্তুষ্ট নয়।

পরস্পরের শরীরের মাংসের দিকে লোলুপ দৃষ্টি পড়ে যায়।

শুরু হয়ে যায় মারামারি। কাটাকাটি।

সবল দুর্বলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

দুর্বল চায় পালিয়ে বাঁচতে।

আক্রমণ ও পলায়নের তাগিদে 'নড়েচড়ে বেড়াবার ক্ষমতাটা' পরান্নভোজীদের মধ্যে অসম্ভব রকম বেড়ে গেলো।

এই বিশেষ দলের জীবাণুরাই রয়েছে জীব জগতের আদিতে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে। সেই আদিম যুগে জীবাণুদের

একটি দল থেকে তৈরি হয়েছে উদ্ভিদ।

অপর একটি দল থেকে জীব।

আদিম কালের এই জীবরা নড়েচড়ে বেড়াতো রকেটের কায়দায়। এদের শরীরের মধ্যে ছিলো বিশেষ এক ধরনের থলি। খুশিমত পানি টেনে নিয়ে এই থলিটিতে পানি ভরে নেয়া যেতো। আবার এই পানিই প্রচণ্ড বেগে বের হয়ে আসতো শরীরের ভেতর থেকে। ফলে শরীরের মধ্যে যে ধাক্কা তৈরি হতো তাই তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতো উলটো দিকে।

এতে কিন্তু অসুবিধাও ছিলো ভীষণ।

খুশিমত বেঁকেচুরে ছুট দেয়া যেতো না।

অথচ এটাই ছিলো তার বিশেষ প্রয়োজন।

চেষ্টা চলতে লাগলো প্রয়োজনের তাগিদে।

আর তাই ধীরে ধীরে এক সময় বেঁকেচুরে ছুট দেয়ার ক্ষমতাও জীবটির মধ্যে এসে গেলো।

পানির মধ্যে ছুটন্ত অবস্থায় লম্বাটে শরীরটাকে বিশেষ কায়দায় বেঁকিয়ে দিলে ছুটটাও বিশেষ দিকে বেঁকে যায়—এই বোধটুকু হওয়াও সেই আদিম জীবের পক্ষে সহজসাধ্য ব্যাপার ছিলো না।

বহু সাধনা আর যথেষ্ট সময়ের ব্যবধানেই তা তাদের আয়ত্তে এসেছিল।

কিন্তু জীবের শরীরটা যতদিন জেলির মত তুলতুলে নরম

থাকছে, ততদিন সেই শরীরকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে যতই খুশি মত ছুট দেবার চেষ্টা করা যাক না কেন, কিছুটা অসুবিধা থাকবেই।

কারণ তার দেহটা জেলির মত তুলতুলে নরম বলে জলের ধাক্কায় অনায়াসেই তালগোল পাকিয়ে যায়।

কাজেই ইচ্ছামত ছুট দেয়া চলে না।

তাছাড়া অন্যদিকে রয়েছে অন্যান্য মাংশাসী জীবরা।

তাদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে শরীরের উপর একটা বর্মের মত শক্ত আবরণ থাকলে ভালো হয়।

জীব জগতে আবার জোর তাগিদ এসে গেলো।

তৈরি হলো জেলির মত নরম শরীরের উপরে বর্মের মত শক্ত একটা আবরণ।

কাঁকড়া বা গলদা চিংড়িকে আজকাল আমরা যে ধরনের বর্ম পরে থাকতে দেখি সেটাই জীব জগতের প্রথম অস্ত্রসজ্জা।

আর এই সময় থেকেই শিলালিপির পৃষ্ঠায় ফসিলের অক্ষরে জীব জগতের ইতিহাস লেখা শুরু হয়েছে।

এখান থেকেই পৃথিবীর ঐতিহাসিক কালের আরম্ভ।

কারণ এই সময়ে জীবের শরীরে শক্ত অংশ তৈরি হবার পর থেকেই ফসিল পাওয়া সম্ভব। তার আগে বড়জোর জেলির মত তুলতুলে নরম শরীরের দু'একটা ছাপ অবিকৃত থেকে যেতে পারে। কিন্তু জীবের দেহাবশেষের কোন নিদর্শন পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

এই ঐতিহাসিক কালের আদিতে পুরাজীবীয় যুগ।

এ যুগটির শুরু হয়েছে আজ থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর আগে। অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজমের একটি আণুবীক্ষণিক বিন্দু চোখের দেখায় চিনতে পারার মত একটি জীবের অবয়ব ধারণ করতে এবং তুলতুলে নরম শরীরের উপরে কঠিন আবরণের একটা বর্মসাজ পরতে সময় নিয়েছিলো প্রায় একশো কোটি বছর।

পুরাজীবীয় যুগের শুরুতে এই বর্মসাজটুকুই জীবের সম্বল।

২

পুরাজীবীয় যুগ

আজ থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর আগেও ভূ-পৃষ্ঠের স্থল ভাগে প্রাণের কোন চিহ্ন ছিলো না।

থাকার কথাও নয়।

পৃথিবীর বাতাস প্রাণের কাকলীতে তখনো মুখর হয়ে ওঠেনি।

আজকের মত সবুজের সমারোহ তখনো জেগে ওঠেনি ধরার বুকে।

শ্যামলতার ছিটেফোঁটাও কোথাও দেখা যায়নি।

অরণ্যহীন।

তৃণহীন।

রুক্ষ অনুর্বর জমি, খোসা-ওঠা দগদগে ঘায়ের মত।

শুধু সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়ালে দেখা যেতো মস্ত একেকটা ঢেউয়ের সঙ্গে দু'একটা জলজ উদ্ভিদ তীরের উপর আছড়ে পড়ছে।

অথবা আলপিনের মাথার মত দু'একটা পোকা সমুদ্রের ধারে ভিজে বলির উপরে নড়াচড়া করছে। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যেতো, এই পোকাগুলোই একমাত্র নিদর্শন নয়। সমুদ্রের পানিতে পর্বে পূর্বে উদ্ঘাটিত হয়ে চলেছে প্রাণের এক বিপুল সমারোহ।

সমুদ্রের ধারে ভিজে বালির উপর যে পোকাগুলো নড়াচড়া করছিলো এদের নাম 'ট্রাইলোবাইট'।

এরা ছিলো সে যুগের সব চাইতে উন্নত জীব।

শক্ত চামড়ায় ঢাকা পড়েছিলো এদের শরীর।

ধড় ও মুণ্ড আলাদা আলাদা ভাবে চেনা যাচ্ছিলো, যদিও আকারে আলপিনের মাথার চেয়ে বড় নয়।

আর মুণ্ডটা নামেই মুণ্ড।

চোখ কান এসব কিছুই নেই।

এভাবে কেটে গেলো আরো কয়েক কোটি বছর।

আরম্ভ হলো অর্ডোভিসিয়ান বা সিলুরিয়ান উপযুগ। এই সময়ে ট্রাইলোবাইটরা আকারে প্রায় এক ফুটের কাছাকাছি হয়ে উঠেছে। এই সঙ্গে বেড়েছে শরীরের বাহার ও জটিলতা।

আরো কয়েক কোটি বছর পর পার্মিয়ান উপযুগে এসে দেখা যায়, ট্রাইলোবাইটরা প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছে।

কারণ পার্মিয়নে উপযুগের পরেই ভূ-পৃষ্ঠে শুরু হয় প্রাকৃতিক বিপ্লব। ফলে নানা জায়গায় জমি উঁচু দিকে ঠেলে ওঠে। নানা জায়গায় সমুদ্র সরে যায়—অনেক উঁচু জমি বা পর্বত নিচে তলিয়ে যায়।

পৃথিবীর এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে ট্রাইলোবাইটরা নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে না পেরে দ্রুত বিলুপ্ত হতে থাকে।

অপোলেশিয়ান বিপ্লবের সময় দেখা যায় ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। দু'একটা দল কোন রকমে হয়তো বেঁচে থাকতে পেরেছিলো—যাদের উত্তর বংশকে আজকাল আমরা কাঁকড়া বা গলদা চিংড়ি ইত্যাদি জীব হিসেবে দেখতে পাই।

প্রায় ত্রিশ কোটি বছর এই ট্রাইলোবাইটরা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিলো।

অবশ্য এদের রাজত্বের সীমানা ছিলো সমুদ্র।

কোন কালে এরা অন্যত্র যাবার চেষ্টা করেনি।

সম্ভবতঃ এদেরই দাপটে সমুদ্রে টিকতে না পেরে এদের সগোত্রীয় আরেক দল জীব আশ্রয় নিয়েছিলো নদীতে বা হ্রদে—মিষ্টি পানির এলাকায়।

এদের নাম দেয়া হয়েছে 'ইউরীপ-টেরিডস্'।

হ্রদে বা নদীতে জীবনযাত্রা একদিকে যেমন নির্বিঘ্ন, অপর

দিকে তেমনি অনিশ্চিত।

হ্রদ বা নদীর পানি সহজেই শুকিয়ে যেতে পারে।

ভূ-পৃষ্ঠের আলোড়নে পানি রাতারাতি স্থানান্তরিত হয়ে যেতে পারে। সে-অবস্থায় এই জলাশ্রয়ী জীবদের মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ নেই।

কিন্তু জীবের ধর্মই হলো পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করা।

কালে কালে, যুগে যুগে এই চেষ্টাই হয়ে আসছে।

আর হয়ে আসছে বলেই সদা চঞ্চল পৃথিবীর প্রাকৃতিক দুর্যোগ জীবকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারেনি।

নিজের পরিবর্তন আর পরিবর্ধনের ভেতর দিয়ে হলেও কোন না কোন রকমে কেউ না কেউ বেঁচে রয়েছে।

অন্ততঃ বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে।

'ইউরীপ টেরিড্স্' জীবদেরও দু'একটা দল ভূ-পৃষ্ঠের আলোড়নের সময় শুকনো ডাঙার উপরে উঠে পড়ে।

এবং এখানেই—ডাঙার সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশেও নিজে-দেরকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

এমনি দু'একটা ছিটকে পড়া দলেরই রূপান্তর হতে হতে শেষ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে বিছে কেল্লো মাকড়সা ইত্যাদি জাতীয় জীব।

পরে আবার এদেরই একটা দল আকাশে উড়তে শুরু করে। তখন এদের নাম হয় পতংগ।

জীব জগতের বিবর্তনের ইতিহাসে তাই 'ইউরীপ টেরিড্স্'-দের স্থানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

'ক্যামব্রিয়ান' উপযুগের শেষের দিকেও যারা সমুদ্রের এলাকা ছেড়ে বেরুতে পারেনি ; যারা লম্বায় ছিলো মাত্র কয়েক ইঞ্চি, কয়েক কোটি বছর পার হতে না হতেই তারা ছড়িয়ে পড়লো জলে-স্থলে-আকাশে। ওদিকে লম্বায় কয়েক ইঞ্চি থেকে হয়ে উঠলো দশ ফিট পর্যন্ত।

আরেক দল জীব পুরাজীবীয় যুগে তেমন দাপট প্রথম দিকে দেখাতে পারেনি।

কিন্তু তারা এমন এক অমোঘ শক্তি সাধনায় নিয়োজিত ছিলো যে, পরবর্তী কালে এরাই বহু কোটি বছর ধরে সারা ভূ-পৃষ্ঠে দুর্দমনীয় রাজত্ব করে গিয়েছে।

পুরাজীবীয় যুগের গোড়ার দিকে যারা রাজত্ব করেছে পৃথিবীতে, তারা বাইরের খোলসটিকে শক্ত করে তুলতে পেরেছিলো। শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই তাদের এ সাধনা করতে হয়েছিলো। লক্ষ লক্ষ বছরের সাধনা আর চেষ্টা তাদের ফলবতীও হয়েছিলো। তবু নড়াচড়ায় এ ধরনের জীবদের অসুবিধা হয়েছিলো প্রচুর। বাইরের শক্ত আবরণের জন্য যখন তখন ইচ্ছামাত্র এদিক ওদিক তাদের শরীরটা নাড়াতে পারছিলো না।

তাই জীব জগতে তাগিদ এসে গেলো।

একদল চেষ্টা করতে লাগলো তাদের নরম তুলতুলে শরীরের

মাঝখানটি দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত শক্ত একটা দণ্ড তৈরি করে নেয়া যায় কি না। ফলে দেখা গেলো, এদের বাইরের দিকের খোলসে কোনরকম কাঠিন্য আসছে না। কিন্তু শরীরের মাঝখানটি দিয়ে একটি দণ্ড একটু একটু করে গড়ে উঠছে।

এবং গোটা শরীরকে ঋজু করে তুলছে।

তারপর, পুরাজীবীয় যুগটি মাত্র পনেরো কোটি বছরের পুরানো না হতেই দেখা গেলো, এই দলটি নিজেদের শরীরের মধ্যে একটি মেরুদণ্ড তৈরি করে ফেলেছে।

শুরু হলো মেরুদণ্ডী জীবের যুগ।

শক্ত খোলসওয়ালা জীব পোকারা হটে গেলো।

আধিপত্য শুরু হলো মেরুদণ্ডওয়ালা-জীব মাছদের।

ভূ-পৃষ্ঠে তখন সিলুরিয়ান উপযুগ চলছে।

এ হলো আজ থেকে চৌত্রিশ কোটি বছর আগের কথা।

তারপর ?

তারপর মেরুদণ্ডী মাছের দল কিভাবে পানি ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছিলো ? কিভাবে রূপান্তরিত হতে হতে সরীসৃপ জাতীয় উভচর জীবের জন্ম দিয়েছিলো সে-ইতিহাসে নতুন কথা বিশেষ কিছু নেই।

স্বাভাবিক নিয়মে ভূ-পৃষ্ঠের বিন্যাসে বারবার আলোড়ন ও আবর্তন এসেছে।

আর সেই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে

গিয়ে বিবর্তনের ধাপে ধাপে জীব-জগৎ অগ্রসর হয়েছে।

যারা পৃথিবীর এই বিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

যতদূর জানা গেছে তাতে দেখা যায়, এই মেরুদণ্ডী মাছের দল পানি ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছিলো আজ থেকে প্রায় ত্রিশ কোটি বছর আগে। ডেভোনিয়ান উপযুগের শেষের দিকে বা কার্বোনিফেরাস উপযুগের শুরুতে।

গোড়ার দিকে এই উভচর জীবরা লম্বায় কয়েক ইঞ্চির বেশি হয়নি। কয়েক কোটি বছর যেতে না যেতেই কার্বোনিফেরাস যুগের শেষের দিকে কুড়ি ফিট পর্যন্ত লম্বা হয়ে উঠেছিলো।

এই উভচর জীবদের দাপটও আবার খুব বেশি দিন থাকেনি।

আপলেশিয়ান বিপ্লবের সময়েই দেখা যায়, উভচর জীবরা পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে না পেরে দ্রুত লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

এবারও দু'একটা ছুটকো দল হয়তো কোনরকমে টিকে থাকতে পেরেছিলো। এদেরই বর্তমান বংশধর হচ্ছে আজকের দিনের ব্যাঙ—গিরগিটি ইত্যাদি কয়েক শ্রেণীর উভচর জীব।

এদের আর একটা দল কিন্তু বহু আগেই তাদের উভচর মর্যাদা খুইয়ে বসে সম্পূর্ণ ডাঙার জীব হয়ে পড়েছিলো। এদেরই রূপান্তরিত রূপ হচ্ছে সরীসৃপ। এই সরীসৃপরাই

মধ্যজীবীয় যুগে দুর্দমনীয় প্রতাপে সারা ভূ-পৃষ্ঠে রাজত্ব করে গেছে।

কিন্তু পুরাজীবীয় যুগের শেষের দিকে যেসব সরীসৃপের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে, তারা কিন্তু চালচলনের দিক থেকে অনেকটা আজকের দিনের সরীসৃপদের মতই ছিলো।

পাগুলো বেরিয়েছে সবই শরীরের পাশ থেকে। কাজেই চলাফেরা করাটা তাদের পক্ষে রীতিমত মেহনতের ব্যাপার।

এ সমস্ত কারণে পুরাজীবীয় সরীসৃপরা আজকের দিনের কুমীরের মত জীবনযাত্রার ব্যাপারে খুব বেশি তৎপরতা ও উদ্যোগ দেখাতে পারেনি। তাই বলে তাদের যে কিছু মাত্র চেষ্টা ও উদ্যম ছিলো না তা নয়। মধ্যজীবীয় যুগে সরীসৃপদের শরীরের গড়ন আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিলো। পায়ের অবস্থান হয়ে উঠেছিলো স্বাভাবিক। শরীর হয়ে উঠেছিলো খাড়া ও ঋজু।

এদের শরীরের গড়নটাই এমন হয়ে উঠেছিলো যে, বিদ্যুতের বেগে দৌড়ঝাঁপ দেয়া চলতো।

পুরাজীবীর সরীসৃপদের দেখে কিছুতেই কল্পনা করা চলতো না যে, তাদেরই বংশধররা কয়েক কোটি বছর পরে এমন অমিত বিক্রম হয়ে উঠবে।

আজকের দিনের হৃত গৌরব সরীসৃপদের দেখেও মধ্যজীবীয় যুগের সরীসৃপদের সম্পর্কে ধারণা করার চেষ্টা বাতুলতা হবে মাত্র।

উদ্ভিদ জগৎ

পৃথিবীর বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ জগতেও আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো।

এরাও সমুদ্রের এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকেনি।

জীব জগতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বা তারও কিছুটা আগেই পানি ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছিলো।

অবশ্য উদ্ভিদের ডাঙায় উঠে আসার ব্যাপারটি ছিলো অপেক্ষাকৃত সহজ। যদিও পদ্ধতিটা ছিলো একই।

ঢেউয়ের সঙ্গে জলজ উদ্ভিদ আছড়ে পড়তো তীরের উপরে। সেই সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তো উদ্ভিদের বীজ।

বিশেষ করে যে সব অঞ্চল মাঝে মাঝে জোয়ারের পানিতে ডুবে যেতো, আবার মাঝে মাঝে ভেসে উঠতো সে অঞ্চলের উদ্ভিদ ক্রমে ক্রমে দু'অবস্থাতেই অভ্যস্থ হয়ে ওঠে।

মিষ্টি পানির কোন একটি এলাকা থেকে হয়তো পানি সরে গেছে। তখন গোটা এলাকার জলজ উদ্ভিদ হয় লোপ পায় কিংবা ডাঙার অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কোনরকমে টিকে থাকে।

অতএব প্রথম অবস্থায় একথা অনুমান করা চলে,

পানি থেকে ডাঙায় উঠে আসার প্রথম অবস্থায় উদ্ভিদ জগৎ সীমাবদ্ধ ছিলো জলাভূমিতে আর সমুদ্রতীরের এলাকায়। সেই উদ্ভিদও ছিলো আবার নিতান্তই ঝোপঝাড়। তাতে না ধরতো ফুল, না হতো ফল। এরপরও বহু কোটি বছর পর্যন্ত উদ্ভিদ বলতে এমনি ঝোপঝাড়কেই বোঝাতো।

জীব জগতের মত এরাও বেড়ে উঠেছে।

বেড়ে উঠেছে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে। নানা পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এদের টিকে থাকার প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে।

এক কালের একটি খর্বকায় ঝোপ পরবর্তীকালে যে আকাশ ছোঁয়া মহীরুহ হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে—এ ঘটনার মধ্যেও বিবর্তনের এক আশ্চর্য ইতিহাসকে পাঠ করা যাবে।

পুরাজীবীয় যুগের শেষ পর্বে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় আটাশ কোটি বছর আগে স্থলজ উদ্ভিদের বিপুল এক সমৃদ্ধি ঘটেছিলো। তবে মনে রাখতে হবে, তখনো উদ্ভিদ বলতে বোঝাতো ঝোপঝাড়ের নিবিড় এক অরণ্য।

তার চাইতে বেশি কিছু নয়।

এবং এই অরণ্যের এলাকাও সীমাবদ্ধ ছিলো জলাভূমি অঞ্চলে ও সমুদ্র তীরে। ভূ-পৃষ্ঠের আলোড়নে এই নিবিড় অরণ্য চাপা পড়েছিলো মাটির নিচে।

এবং এগুলো কোটি কোটি বছরের মাটির চাপে ও ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপে রূপান্তরিত হয়েছে কয়লায়। আজকের দিনের

সমস্ত কয়লার খনি সেই বিশেষ সময়ের সমৃদ্ধ উদ্ভিদ জগ-তেরই সাক্ষ্য এবং এজন্যই এ বিশেষ উপযুগের নাম দেয়া হয়েছে 'কার্বনিফেরাস'।

৩

মধ্যজীবীয় যুগ

এবার আমরা মধ্যজীবীয় যুগ সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

এ যুগের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে কি দেখবো?

দেখবো, এযুগে সব কিছুই অতিকায়।

সব কিছুই বৃহৎ।

পুরাজীবীয় যুগের তুলনায় এ যুগের উদ্ভিদ ও জীবজগৎ সবই অনেকগুণ বড়। মনে হবে, সব যেন কোন যাদু-মন্ত্র বলে বিরাট বিরাট হয়ে উঠেছে।

সে যুগ ছিলো আশ্চর্য ও ভয়ংকরের যুগ।

মস্ত বড় এক একটা আকাশ ছোঁয়া গাছ ডালে আর পাতায় এমন নিশ্ছিদ্র যে, সূর্যের আলো মাটিতে পৌঁছতে

পারে না।

কিন্তু হঠাৎ দেখা যাবে, সেই আকাশ ছোঁয়া গাছেরও মাথা ছাড়িয়ে ধক্ ধক্ করছে কোন একটি অপার্থিব জন্তুর হিংস্র চোখ।

নিস্তরঙ্গ জলাভূমি একটুকরো কাচের মত সূর্যের আলোয় জ্বলছে।

হঠাৎ তুমুল তোলপাড় জাগিয়ে ভেসে উঠছে পাহাড়ের মত অতিকায় কোন জল-জন্তুর কালো চকচকে পিঠ।

যেদিকে তাকানো যাক্, জীবনের এক সুবিপুল প্রাচুর্য বেহিসেবী মাত্রায় স্তূপ স্তূপ হয়ে আছে বলে মনে হবে। যেন রূপকথার সেই দৈত্যটা পুরাজীবীয় যুগের বদ্ধ জায়গা থেকে বের হয়ে এসে মধ্যজীবীয় যুগে স্বমূর্তি ধারণ করেছে। আর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়ছে। যেমনি তাদের অতিকায় শরীর, তেমনি তাদের অমিত বিক্রম।

মধ্যজীবীয় যুগের এ দৈত্যদের ছবি আঁকতে গিয়ে মানুষের কল্পনাও হার মেনে যায়।

আজকের দিনের অতিকায় বা অমিত বিক্রমের যা কিছু নিদর্শন আমরা দেখি মধ্যজীবীয় যুগের তুলনায় তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। হিমালয়ের সঙ্গে একটি টিলার যতোখানি তফাৎ, প্রায় তেমনি তফাৎ এই দুই পাশাপাশি যুগের জীবের মধ্যে।

এ যুগের একটি হিপোপটেমাসের ওজন বড়জোর দু'টন

এবং লম্বায় দশ ফিটের বেশি নয়। কিন্তু মধ্যযুগের জলজন্তু ব্রন্টোসরাসের ওজন অন্তত পঞ্চাশ টন এবং সেটি লম্বায় অন্ততঃ পঁচিশ গজ।

এ যুগের পশুরাজ সিংহ মধ্যজীবীয় যুগের ট্রাইরানোসরাসের কাছে একটা ছারপোকার মত দুর্বল। সঙ্গীতের ভাষায় মধ্যজীবীয় যুগটি মস্ত একটি গমক। আর পুরাজীবীয় ও নবজীবীয় যুগ দুটো ছোটখাট গিটকিরি মাত্র।

অতিকায় জীবজন্তুর এই যুগটি প্রায় বারো কোটি বছর পর্যন্ত চলেছিলো। জীব বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ যুগ মানব কল্পনার জন্য এক বিস্ময়।

রহস্যময় আর ভয়াবহ।

মধ্যজীবীয় যুগে পা দিয়ে প্রথমেই চোখে পড়বে, খটখটে শুকনো ডাঙার জমিতেও প্রাণের মহোৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে। আর সেখানে আধিপত্য করছে দৈত্যের মত বিপুলকায় একটি জীব—ডাইনোসর। বলা বাহুল্য, এই জীবটি একদিনে আচমকা এমন অতিকায় হয়ে ওঠেনি।

মধ্যজীবীয় যুগের প্রথম পর্বেও দেখা যায়, এই জীবটি লম্বায় পনেরো ফিটের বেশি নয়। চেহারার দিক থেকে প্রায় এ যুগের ক্যাংগারুর মত। পেছনের পা দুটি বেশ বড়। এবং রীতিমত বলশালী। লেজটিও তাই। ছুটবার সময়ে এই লেজের সাহায্যে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে।

কিন্তু কয়েক কোটি বছর না পেরুতেই এই মাঝারি

গোছের জীবটি আকারে ও হিংস্রতায় পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছে। টাইরোনোসরাসের কথা আগেই বলেছি। এটিও এক জাতের ডাইনেসর। এই সরীসৃপটি লম্বায় পঞ্চাশ ফিটেরও বেশি। ওজন দশ টনের কাছাকাছি। এ সময়ে টাইরোসনোরাস ছিলো জীব জগতের আতঙ্ক। হিংস্রতার দিক থেকে এই মাংসাশী জীবটির কোন তুলনা ছিলো না।

মধ্যজীবীয় যুগের মাঝামাঝি কালে এসে দেখা যায়, ডাইনোসরদের নানা প্রকার ভেদ ঘটেছে। ছড়িয়ে পড়েছে



মধ্যজীবীয় যুগের তিনটি সরীসৃপ। বাঁ-দিকে স্টেগোসরাস (শিরদাঁড়া বরাবর মজবুত বর্ম), মধ্যে ব্রন্টোসরাস (ওজনে ৫০ টন, লম্বায় ১০০ ফিট) ডান-দিকে ডিপ্লোডোকাস।

নানা শাখা প্রশাখায়। তাদের মধ্যে মিল শুধু এটুকু যে, সকলে পেছনের দু'পা ও লেজের উপরে ভর দিয়ে ছোটে। সামনের খুদে ক্ষুদে থাবা দুটোকে ব্যবহার করে একমাত্র খাবার সময়ে বা লড়াই করবার সময়ে।

এরা সকলেই ছিলো মাংসাশী জীব।

যেমন অনিথোমাইমাস।

এই সরীসৃপটির চেহারাও ক্যাঙ্গারুর মত।

কিন্তু আকারে তেমন বড় নয়।

সে যুগের অন্যান্য জীব জন্তুর তুলনায় ছোটই বলা চলে।

চেহারার দিক থেকে এদের বরং খানিকটা মিল এ যুগের উট পাখির সঙ্গে খুঁজে পাওয়া যায়।

পাখিদের মতই লম্বা ঠোঁট।

দাঁত নেই।

পোকা মাকড় খেয়ে জীবন বাঁচায়।

সে যুগের তুলনায় নিতান্তই শান্তিপ্রিয় জীব।

যেমন, অ্যাল্লোসরাস। সারা গায়ে মস্ত মস্ত আঁশ। মুখের হাঁ-টা প্রকাণ্ড। দু'পাটি ধারালো দাঁত। হিংস্রতায় এই সরীসৃপটিও বড়ো কম যায় না।

যেমন, গোর্গোসরাস।

যেমন, সেরাটোসরাস।

এমনি আরো অনেক।

অধিকাংশই যেমন অতিকায়, তেমনি বলশালী আর তেমনি হিংস্র।

এদের সামনে পড়লে সে যুগের অন্যান্য জীবরা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারতো না।

অন্যান্য জীব বলতে সরীসৃপদেরই অন্যান্য কয়েকটি দলকে বুঝাতো।

এদের চেহারা অনেকটা এ যুগের গিরগিটির মত।



মধ্যজীবীয় যুগের দুটি হিংস্র সরীসৃপ। বাঁ-দিকে ধারালো শিংযুক্ত ট্রাইসেরাটপ্‌স; ডান-দিকে মধ্যজীবীয় যুগের আতঙ্ক টাইরানোসরাস।

ক্যাঙ্গারুর মত দু-ঠেঙে নয়।

এ দলের ব্রন্টোসরাসের কথা আগেই বলা হয়েছে। গিরগিটির সঙ্গে মিল শুধু শরীরের গড়নের দিকে। নইলে এই পঞ্চাশ টন ওজনের (প্রায় ১৩৫০ মণ) ও ২৫ গজ লম্বা এই চতুষ্পদী সরীসৃপটির তুলনা চলে একমাত্র পাহাড়ের সঙ্গে।

মধ্যজীবীয় অরণ্যে ও জলাভূমিতে এ ধরনের পাহাড় প্রমাণ জীবের সাক্ষাৎ যেখানে সেখানে পাওয়া যেতো। পাওয়া যেতো ডিপ্রোডোকাস-এর বা স্টেগোসরাস-এর। আকার ও শারীরিক গড়নে এ দুটো চতুষ্পদী সরীসৃপও ব্রন্টোসরাসের সমগোত্রীয়।

তবে 'সেন্টগোসরাস'এর একটি বিশেষত্ব হলো এই যে, জীবটির শিরদাঁড়া বরাবর ইস্পাতের মত কঠিন একটি বর্মের

সাজে আছে। আবার এই চতুষ্পদী সরীসৃপদের মধ্যে অন্য ধরনের অস্ত্র সজ্জাও ছিলো।

যেমন, ট্রাইসেরাটপ্‌স বা প্রোটোসেরাটপস।

এদের মাথার সামনের দিকে ছিলো মস্ত ধারালো শিং। অনেকটা এ যুগের বণ্য বরাহের শিং এর মত।



মধ্যজীবীয় যুগের জলাশ্রয়ী সরীসৃপ। বাঁ-দিকে রাজহাঁসের মত লম্বা গলা-ওয়ালা প্লেসিওসরাস; ডান-দিকে পানি থেকে লাফিয়ে-ওঠা অবস্থায় কিম্ভূত মাছের মত ইক্‌থিওসরাস।

সে যুগের সরীসৃপরা শুধু ডাঙাতেই রাজত্ব করে যায়নি।

এতক্ষণ বলা হলো শুধু ডাঙার সরীসৃপদের কথা।

এরা পানির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিলো।

স্থলভাগের মত জলভাগেও ছিলো এদের অবাধ রাজত্ব। সমুদ্রের পানি তোলপাড় করে এরা ঘুরে বেড়াতো।

হানাহানি ও কাটাকাটির অন্ত ছিলো না।

'ইক্‌থিওসরাস বা প্লেসিওসরাস'এর নাম এখানে উল্লেখ

করা চলে।

ইক্‌থিওসরাসের চেহারাটা হচ্ছে অতিকায় একটা মাছের মত।

আর প্লেসিওসরাস ছিলো কিন্তু তাকার।

এর লম্বা গলাটির জন্য রাজহাঁসের চেহারার সঙ্গে খানিকটা মিল পাওয়া যায়।

এ সরীসৃপদের খাদ্য ছিলো মাছ।

জীব বিজ্ঞানীদের মতে, এই জলচর সরীসৃপরা শুকনো ডাঙার জীবনকে বরদাস্ত করতে পারেনি বলে পানিতে ফিরে গিয়েছিলো। যেমন, এ যুগের শীল, শুশুক, তিমি ইত্যাদি জীবরা জল-জীবনে ফিরে গিয়েছে।

শুধু জলে স্থলে নয়, আকাশ রাজ্যেও এরা সমান আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলো। তখনো কিন্তু পাখির জন্ম হয়নি। আকাশের সম্রাট ছিলো ওই সরীসৃপরাই।

এই সম্রাট দলের সম্রাট ছিলো টেরোডাকটিল।

এদের শরীরের কোথাও পালক বা রোঁয়ার চিহ্ন মাত্র ছিলো না। এই জীবটি দেখতে যে ভয়াবহ ছিলো তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রোঁয়া ওঠা।

কুৎসিত গা।

পালকহীন চামড়ার ডানা।

তার ওপর ধারালো দাঁতওয়ালা মুখ।

মধ্যজীবীয় যুগের শেষ পর্ব ক্রেটাসিরাস উপযুগে এই টেরোডাকটিলরা এমন অতিকায় হয়ে উঠেছিলো যে, আরব্য-পোন্যাসের সেই 'আকাশ অন্ধকার করা উটপাখিটা'ও তার কাছে হার মানবে।

ডানা ছড়ানো অবস্থায় এক ডানার প্রান্ত থেকে অপর ডানার প্রান্ত পর্যন্ত টেরোডাকটিলের শরীরের মাপ ছিলো পঁচিশ ফিট। আর সেই ডানার এমন প্রচণ্ড শক্তি যে, এক একটা ঝাপটে এ যুগের দশ বারোটা ফাইটার প্লেন অনায়াসেই কুপোকাত হতে পারে।

যত ভয়াবহই হোক, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এরাই ছিলো পাখিদের পূর্ব পুরুষ। এমন কি সেই মধ্যজীবীয় যুগেই দেখা যায়, উড়ন্ত সরীসৃপদের রূপান্তর হতে শুরু হয়েছে। ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে পাখির লক্ষণ।

এমনি একটি আকাশচারী জীবের নাম আর্কিওপটে-রিক্স। সরীসৃপ ও পাখির অদ্ভুত এক সংমিশ্রণ।

লক্ষণের বিচারে এরা আধা-সরীসৃপ।

আধা পাখি।

আজকের যে পাখি দেখে আমরা মুগ্ধ হই।

যে পাখি এত ক্ষীণজীবী যে হাতের মুঠোয় ধরলে একদলা নরম তুলতুলে তুলোর মত ধুকপুকিয়ে ওঠে।

যে পাখি গান গায়, শিস দেয় আর দিনের আলোকে অজস্র কাকলিতে ভরিয়ে তোলে, সে পাখির আদি পুরুষ

ছিলো ভয়াবহ এক হিংস্র জীব। আজ আমরা একথা ভাবতেও পারি না।

কল্পনা করলেও ভয়ে শিউরে উঠতে হয়।

অথচ তাই হয়েছে।

অবাক হবার কিছুই নেই।

প্রাণের বিবর্তন নিজস্ব ধারায় অগ্রসর হয়েছে।

হচ্ছে।

হবে।

জীব বিজ্ঞান এ সম্পর্কে নির্মম সত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে।

আমরা যে মানুষ, আজকের পৃথিবীর জল, স্থল ও আকাশের জীবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানে-গুণে গরিমায় সব যুগের জীবকে ছাড়িয়ে গিয়েছি এবং যে মানুষ আজ চাঁদের দেশ পর্যন্ত ঘুরে এসেছি, সে মানুষের পূর্বপুরুষের পরিচয় দিতে গেলে আত্মাভিমানে আঘাত লাগারই কথা।

অথচ সত্য—সত্যই।

একে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

আমাদের ভালো লাগা, না-লাগার ওপর পৃথিবীর বিবর্তন গড়ে ওঠেনি।

বিবর্তন তার নিজ ধারায় এগিয়ে চলেছে।

মধ্যজীবীয় যুগে তাহলে দেখা যাচ্ছে সরীসৃপরা জলে স্থলে ও আকাশে অবাধ রাজত্ব করে গেছে। শারীরিক

গড়ন ও শক্তিমত্তার দিক থেকে সরীসৃপদের সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন জীব পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন যুগে জন্ম নেয়নি।

প্রাণের এমন উচ্ছল মহোৎসব পৃথিবীর ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা।

এমনটি কখনো হয়তো আর দেখা যাবেও না।

তবু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, সরীসৃপদের এই অবাধ রাজত্ব 'ঘূর্ণিহাওয়ায় এক মুঠো ধুলো উড়ে যাওয়ার' মত বিলীন হয়ে গিয়েছে।

এতবড় একটা দুর্ঘটনাও জীব বিজ্ঞানের ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি।

কিন্তু, কেন এমনটা হলো?

প্রাণী জগতে এতবড় একটা দুর্ঘটনা কি করে ঘটতে পারলো?

মধ্যজীবীয় যুগের শেষ ভাগে এসে দেখা যাচ্ছে, টাইরানোসরাস, স্টেগোসরাস, ইকথিওসরাস, প্লেসিওসরাস এবং যেখানে যতো 'সরাস' ছিলো, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

যাদের দাপটে দশ কোটি বছর ধরে পৃথিবীর মাটি কেঁপে কেঁপে উঠেছে, তাদের অস্তিত্ব এমন ভাবে মুছে যেতে পারে, একথা কল্পনা করা সত্যিই দুঃসাধ্য।

হিমালয়কে দেখে কি আমরা কল্পনা করতে পারি যে, এই হিমালয় আর কয়েক কোটি বছরের মধ্যে রেণু রেণু

হয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবে ?

না।

এ কল্পনা আমাদের কল্পনারও বাইরে।

অথচ পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাসে এ অসম্ভব নয়।

একদিন তাই ঘটবে।

মধ্যজীবীয় জীবজগতকে এই হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

তার অস্তিত্ব ও অবলুপ্তি দু-ই পরম বিস্ময়ের ব্যাপার।

প্রকৃতির পরিবর্তনের বা বিবর্তনের কোটি কোটি বছরের হিসাব আমাদের ক্ষুদ্র মানব মনের পক্ষে কল্পনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

প্রাণী জগতে এতবড় একটা দুর্ঘটনা কি করে সম্ভব হয়েছিলো এ সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করা চলে মাত্র।

এর বেশি কিছু নয়।

নির্দিষ্ট কোন কারণ বলা সম্ভবও নয়।

এ সম্বন্ধে জীব বিজ্ঞানীরা নানাজনে নানা অনুমান করেন।

কারও মতে, নব জীবীয় বিপ্লবের ফলে ভূ-ত্বকের বিন্যাসে ও ভূ-পৃষ্ঠের জলবায়ুতে যে বড় রকমের একটা পরিবর্তন এসেছিলো, তা সরীসৃপদের জীবন ধারণের পক্ষে উপযোগী ছিলো না।

সে সময়ে বহু জায়গায় নতুন নতুন পর্বত তৈরি হয়েছিলো।

বহু জায়গা থেকে সমুদ্র সরে গিয়েছিলো। জলবায়ুর দিক থেকেও শুরু হয়েছিলো নতুন একটা হিমযুগ।

কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠের কোন পরিবর্তনই আকস্মিক নয়।

ছোটখাট পরিবর্তনের জন্যও হাজার বা লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগে। তবু সরীসৃপরা কেন এই নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের একেবারেই খাপ খাওয়াতে পারেনি, এ প্রশ্নের কোন জবাব সঠিক ভাবে পাওয়া সম্ভব নয়।

তাছাড়া আমরা জানি, ডাইনোসররা শুকনো ডাঙার জীবনেও রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। সুতরাং ভূ-ত্বকের বিন্যাসগত পরিবর্তন ডাইনোসরদের অবলুপ্তির কারণ হতে পারে না। জলবায়ুর পরিবর্তনটাও যে কারণ নয়, তা বোঝা যায় যখন দেখি, হিমযুগ শুরু হবার বহু আগেই টেরোডাকটিলরা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

তাহলে আর কি কারণ থাকতে পারে?

কারো কারো মতে, স্তন্যপায়ী জীবদের সঙ্গে সরীসৃপরা এঁটে উঠতে পারেনি বলেই তাদের এই পতন।

এও ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মধ্যজীবীয় যুগের শেষ পর্ব হচ্ছে স্তন্যপায়ী জীবদের উঠতি যুগ। একথাও ঠিক যে, নতুন পরিবেশের সঙ্গে স্তন্যপায়ীরা যতোটা খাপ খাওয়াতে পেরেছিলো সরীসৃপরা তা পারেনি।

তবুও স্তন্যপায়ীদের কাছে সরীসৃপদের নাজেহাল হবার কোন

প্রশ্নই ওঠে না।

সরীসৃপদের তুলনায় স্তন্যপায়ীরা এত ক্ষুদ্রকায় ও ক্ষীণজীবী যে, হাতীর কাছে পিঁপড়ের মত স্তন্যপায়ীরাই পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতো।

অনেকে বলেন যে, স্তন্যপায়ীরা সরীসৃপদের ডিম খেয়ে ফেলতো। তাই তাদের জন্মের হার অসম্ভব দ্রুত কমে যেতে থাকে ও এক সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এও পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

পাখির ডিম সাপে খায়।

তাই বলে কি পাখির জন্ম বন্ধ হয়ে গিয়েছে?

পাখিও এ ক্ষেত্রে দুর্বল।

সাপ সবল।

তবু পাখির বংশ নিশ্চিহ্ন হয়নি কেন?

কোন কোন ভূ-বিজ্ঞানী অনুমান করেন, ইক্‌থিওসরাস বা এ ধরনের কোন কোন সরীসৃপের সরাসরি বাচ্চা হতো। ডিম ফোটানো হতো না।

সরীসৃপদের বাচ্চা, সরীসৃপই হতো।

কোন স্তন্যপায়ীর সাধ্য ছিলো না সেই বাচ্চা সরীসৃপের সঙ্গেও এঁটে ওঠে।

তাহলে আর কি কারণ থাকতে পারে?

আগেই বলেছি, এ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোন কারণ বলা সম্ভব নয়। অনুমান বা কল্পনা করা চলে মাত্র।

আমরা জানি, জাতি হিসেবেই কোন জীব যখন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে, সেই জাতির জীবনী শক্তিতেই ঘুণ ধরেছে।

জাতিকে জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কখন ?

যখন সেই বিশেষ জাতির বংশ রক্ষার ক্ষমতা থাকে না।

বংশ রক্ষার ক্ষমতা কখন থাকে না ?

যখন জাতির এক পুরুষের জীবকোষ থেকে পরবর্তী পুরুষের জীবকোষ তৈরি হওয়া সম্ভব হয় না। অর্থাৎ জীবকোষের মধ্যেই বার্ধক্য এসে যায়।

এ ব্যাখ্যা যে সঠিক, তাও আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না। তবে অনেকের মতে, একক জীবনে যেমন শৈশব-যৌবন-বার্ধক্য রয়েছে, তেমনি আছে জাতির জীবনেও।

বিশেষ কোন জাতির জীবকোষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন বুঝতে হবে সেই জাতির লীলা খেলা শেষ।

সরীসৃপরাও হয়তো এমনি একটি জাতি।

এরা হয়তো বার্ধক্যের স্বাভাবিক নিয়মেই ভূ-পৃষ্ঠ থেকে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

যাক, সরীসৃপদের যুগ শেষ হলো।

আরম্ভ হলো নবজীবীয় যুগ।

এ যুগ প্রায় সাত কোটি বছর আগে শুরু হয়ে এখনও চলছে।

এ যুগ স্তন্যপায়ীদের যুগ।

স্তন্যপায়ীরা সরীসৃপদের চাইতে অনেক উচ্চতর পর্যায়ের

জীব।

শরীরের গড়ন ও ক্ষমতার দিকে সরীসৃপদের তুলনায় এরা কিছুই নয়।

তবু এরা টিকে গিয়েছে।

বিরাট দেহ আর অসম্ভব শক্তি নিয়েও সরীসৃপরা টিকে থাকতে পারেনি।

প্রকৃতির নির্মম বিধান মেনে নিয়ে তাদের পৃথিবী থেকে সরে পড়তেই হলো একদিন। অথচ তাদের চাইতে হাজার গুণ নিকৃষ্ট ও দুর্বল স্তন্যপায়ীরা জয় করে নিলো প্রকৃতিকে।

৪

নবজীবীয় যুগ

নবজীবীয় বা স্তন্যপায়ীদের যুগ আজ থেকে প্রায় সাত কোটি বছর পূর্বে আরম্ভ হয়ে আজও চলছে।

আর কতদিন চলবে, কে জানে।

নাকি সরস্রীপদের মত এরাও এক কালে ধরার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? একথা কি ঠিক করে কেউ বলতে পারে?

না।

পারে না।

তবু আশা করা যাচ্ছে, স্তন্যপায়ীদের কয়েকটা বিশেষ গুণ রয়েছে, যা সরীসৃপদের মধ্যে ছিলো না। হয়তো এই

"বিশেষ গুণটুকুই" তাদের বাঁচিয়ে রাখবে।

অবশ্য যদি কোন বড় রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটে।

স্তন্যপায়ীদের বিশেষ গুণগুলোর অন্যতম হলো মাতৃস্নেহ।

সরীসৃপরা ডিম পেড়েই খালাস।

তারপর আর তাদের কোন দায়িত্ব থাকে না।

সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুতে পারলো কি না এবং বেরিয়ে আসার পরে টিকে থাকতে পারলো কি না, সে সম্পর্কে তারা ছিলো নির্বিকার।

স্তন্যপায়ীরা সম্পূর্ণ এদের বিপরীত।

এরা যে সরীসৃপদের চাইতে উন্নততর জীব তা তাদের বাচ্চাদের সম্পর্কে দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারেই প্রমাণিত হয়।

আজ থেকে প্রায় পনেরো কোটি বছর আগে একদল ক্ষুদে ক্ষুদে জীবের মধ্যে নতুন একটা লক্ষণ দেখা গিয়েছিলো। তারা ডিম না পেড়ে গর্ভধারণ করতো এবং জীবন্ত বাচ্চা প্রসব করতো। তারপরও সেই বাচ্চা তার অসহায় শৈশব কালটি কাটাতো মায়ের কোলে—মায়ের রক্ষণাবেক্ষণের নিরাপদ আশ্রয়ে এবং মায়ের বুকের দুধ পান করে।

প্রাণের ইতিবৃত্তে এটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের লক্ষণ।

একশো কোটি বছরেরও অধিককাল ধরে ভূ-পৃষ্ঠে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু মাতৃস্নেহের ইতিহাস মাত্র পনেরো

কোটি বছরের। এর আগের সুদীর্ঘকাল জীব জগৎ মাতৃ-স্নেহ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলো। এই মাতৃস্নেহের সঞ্জীবনী শক্তি যে কি বিপুল তা কয়েক কোটি বছরের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

কারণ, দেখা গেলো মধ্যজীবীয় যুগের সেই অমিত বিক্রম সরীসৃপরা অতিকায় শরীর নিয়েও জীবন যুদ্ধে পরাজিত। অথচ মাতৃস্নেহে সঞ্জীবীত ক্ষুদ্রকায় স্তন্যপায়ীরা আজ সারা ভূ-পৃষ্ঠে আধিপত্য করছে।

আর একটা ব্যাপারে স্তন্যপায়ীরা সরীসৃপদের ওপরে টেক্কা দিয়েছিলো। তা হলো সরীসৃপদের রক্ত ছিলো ঠাণ্ডা। স্তন্যপায়ীদের রক্ত হলো গরম।

এ ছাড়া অন্য কোনদিকে সরীসৃপদের ও স্তন্যপায়ীদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিলো না।

একই ধরনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

একই ধরনের মাংসপেশী।

একই ধরনের স্নায়ু ও মস্তিষ্ক।

স্তন্যপায়ীদের তুলনায় সরীসৃপদের শরীরের গড়ন ছিলো খুবই মজবুত।

পরাক্রম ছিলো খুবই বেশি।

তবু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, উষ্ণ-রক্তধারীরা যতো সহজে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে, শীতল-রক্ত ধারীরা তা পারেনি।

কোন কোন ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে পুরাজীবীয় যুগের শেষ পর্বেই একদল সরীসৃপ জাতীয় জীবের শরীরে দুগ্ধ গ্রন্থি তৈরি হতে শুরু হয়েছিলো। অনুমান করা চলে, এই বিশেষ জাতীয় জীবের নিজেদের বাচ্চা সম্পর্কে উৎকণ্ঠা ছিলো খুবই বেশি। যতদিন বাচ্চারা নিজেদের পায়ে সবল হয়ে দাঁড়াতে না পারছে ততদিন মায়েরা তাদের আগলে আগলে বেড়াতো।

সে যুগের পক্ষে বাচ্চাদের সম্পর্কে এতখানি উৎকণ্ঠা ও সতর্কতা জীবজগতের এক অভাবনীয় ঘটনা।

নবজীবীয় যুগের প্রথম পর্বে পা দিয়ে দেখা যায়, স্তন্যপায়ী জীবরা নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে সারা ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়েছে।

অবশ্য একমাত্র অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে আজ পর্যন্ত কোন স্তন্যপায়ী জীবের ফসিল পাওয়া যায়নি। অনুমান করা চলে, এই মহাদেশে স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব হয়েছে অনেক পরে। আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, একমাত্র এই মহাদেশটিতেই এখনো ক্যাঙ্গারু-জাতীয় জীবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

আজকের দিনে স্তন্যপায়ী জীবদের যে চেহারা আমরা দেখি, তখনো মোটামুটি সেই একাই ধরনের চেহারা ছিলো। তবে এখনকার তুলনায় তখন আকারে অনেক ছোট ছিলো। যেমন, এ যুগের ঘোড়া, হাতী, শুয়োর

গণ্ডার, বরাহ ইত্যাদি প্রাণীদের জায়গায় সে যুগে ছিলো একটি মাত্র স্তন্যপায়ী জীব—কেনাকোডাস।

কেনাকোডাস আকারে শেয়ালের চেয়ে বড়ো ছিলো না। এদের শরীরটা ছিলো লম্বাটে। নাকটা ছিলো চোখা। পাগুলো ছোট ছোট।

প্রায় সাত কোটি বছর লেগেছে এই স্তন্যপায়ী জীবটির বড়ো হয়ে বর্তমান আকারে পৌছতে।

এবং নানা শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়তে।

অন্যান্য জীবের মধ্যে ছিলো ক্ষুদে ক্ষুদে বানর, যারা গাছের ডালে ডালে লাফালাফি করে বেড়াতো।

আর ছিলো একদল হিংস্র মাংসাশী জীব। যাদের বলা হতো 'ক্রিয়োডোণ্ট'।

এই ক্রিয়োডোণ্টরাই পরে ছ'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে।

একদলের চেহারা হয়েছে কুকুরের মতো। যেমন, কুকুর নেকড়ে, ভাল্লুক ইত্যাদি।

আর একদলের চেহারা হয়েছে বেড়ালের মতো। যেমন, বেড়াল, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি।

অবশ্য নবজীবীয় যুগের প্রথম পর্বের সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবই যে টিকে থেকেছে তা নয়। কোন কোন শাখা লুপ্ত হয়েছে। আবার বের হয়ে এসেছে নতুন শাখায়।

যারা টিকে থেকেছে তারা হয়ে উঠেছে বড়ো।

সাত কোটি বছর ধরে একটু একটু করে বড়ো হয়ে পৌছেচে

আজকের আকারে।

আমরা আগেই বলেছি, ভূ-পৃষ্ঠের জলবায়ু চিরকালই আজকের মত ছিলো না।

হিমযুগের সময়কে বাদ দিলে ভূ-পৃষ্ঠের জলবায়ু মোটা-মুটি উষ্ণ মণ্ডলীয়।

সুতরাং অনুমান করা চলে, সেই উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ুর যুগে স্তন্যপায়ী জীবরা ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

এই অনুমান যে সঠিক, তার প্রমাণ মস্কো-প্যারিস নিউইয়র্ক -পিকিং অঞ্চলেও বাঘ, সিংহ, গণ্ডার-হিপোপটেমাস ইত্যাদি উষ্ণমণ্ডলীয় জীবের ফসিল পাওয়া গিয়েছে।

তারপর হিমযুগে মস্ত মস্ত হিমবাহ পর্বতের চূড়ো থেকে নেমে আসতে শুরু করে। প্রচণ্ড শীতে উদ্ভিদ ও জীবের অবস্থা হয়ে ওঠে প্রাণান্তকর। এ সময়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই উদ্ভিদ ও জীবকে সরে যেতে হয়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে।

কিন্তু সবাই সরে যেতে পারেনি।

যে কোন কারণেই হোক দু'একটা ছুটকো দল থেকে গিয়েছিলো সেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেই।

উদ্ভিদ জগৎ সেই প্রচণ্ড শীতকে একেবারেই সহ্য করতে পারেনি।

জীব জগৎ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ

খাইয়ে নেয়ার জন্য সংগ্রাম করেছে। এই সংগ্রামে যারা জয়ী হতে পেরেছে তাদের শরীরের চামড়ার ওপর তৈরি হয়েছে মেরু অঞ্চলের শীত সহ্য করার মত ঘন পশম। এই ঘন পশমওয়ালা জীবরা আজও মেরু অঞ্চলের বাসিন্দা।

আবার এ দলের মধ্যে থেকেও অনেকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিদায় নিয়েছে। জলবায়ু সহ্য করার ক্ষমতা হয়তো তাদের ছিলো, কিন্তু প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামে অন্যান্য ক্ষেত্রে হেরে গিয়ে টিকে থাকতে পারেনি।

এমনি একটি জীব হচ্ছে ম্যামথ।

ম্যামথ দেখতে অবিকল হাতীর মত।

তেমনি শুঁড়।

তেমনি দাঁত।

সারা গায়ে ঘন বাদামী পশম।

বরফ ঢাকা প্রান্তরের উপর দিয়ে এই জীবটি যখন গজেন্দ্র-গমনে চলাফেরা করতো, তখন অবশ্যই তা দেখার মত দৃশ্যই ছিলো।

সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে বরফের নিচে জমে থাকা একাধিক ম্যামথের শরীর পাওয়া গিয়েছে।

বানর থেকে মানুষ

মনুষ্য সদৃশ বিশেষ জাতীয় বানর
থেকে আধুনিক মানব

৫

মনুষ্য সদৃশ বানর

জীব জগতের ইতিহাসে মানুষের অস্তিত্ব একেবারেই সাম্প্রতিক কালের।

মাত্র কয়েক লক্ষ বছর তার বয়স।

পৃথিবীর অস্তিত্বকালের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও নগণ্য ঘটনা।

অথচ এই অকিঞ্চিৎকর ও নগণ্য ঘটনাটির গুরুত্ব এত বেশি যে, বিষয়টি নিয়ে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা করতে হচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে, নবজীবীয় যুগের শুরুতে দেখা

যায়, একদল স্তন্যপায়ী জীব মাটি ছেড়ে গাছের ডালে আশ্রয় নিয়েছে। জীবন ধারণের তাগিদে এই দলটিকে কয়েকটি নতুন গুণ অর্জন করতে হয়েছিলো। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ হলো প্রখর দৃষ্টিশক্তি।

যেসব জীব মাটিতে চলাফেরা করে তাদের দৃষ্টিশক্তির চেয়ে ঘ্রাণশক্তি বেশি।

এবং তাদের জন্যে ঘ্রাণশক্তিটাই বেশি দরকার।

বনে জঙ্গলে চলাফেরা করতে হলে চোখের দেখাটা বেশি কাজে লাগে না। গন্ধ শুঁকে কোন কিছু সম্পর্কে আগে থেকে আঁচ করতে না পারলে যেমন পদে পদে জীবন বিপন্ন হতে পারে, তেমনি পদে পদে শিকারও ফসকে যেতে পারে।

যেসব জীব গাছের ডালে চলাফেরা করে তাদের জন্যে ঘ্রাণশক্তির চেয়ে দৃষ্টিশক্তি থাকাটা আরও বেশি জরুরী।

এই জরুরী তাগিদ থেকেই ক্রমে এই বৃক্ষাশ্রয়ী জীবদের দৃষ্টিশক্তি প্রখর হতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত মাথার খুলির আদলটা পর্যন্ত এমন ভাবে পালটে যায়, যেন দু'চোখ দিয়ে সিধে সামনের দিকে তাকানো চলে এবং দু'চোখের দৃষ্টি একই বস্তুর ওপরে নিবদ্ধ হতে পারে।

স্তন্যপায়ী জীবদের আর একটা লক্ষণ হলো, এদের সকলেরই মাথায় খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক নামে একটি পদার্থ

রয়েছে।

যতো বেশি উন্নত পর্যায়ের জীব ততো বড় মস্তিষ্ক।

এ ভাবেই বড় হতে-হতে সবচেয়ে উন্নত পর্যায়ের জীব মানুষের মাথায় সবচেয়ে বড় মস্তিষ্ক গড়ে উঠেছে।

স্তন্যপায়ী জীবদের যুগে এসেই প্রথম দেখা যায়, প্রাণের বিবর্তনে মস্তিষ্কেরও একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এতদিন পর্যন্ত দেখা গিয়েছিলো যে জীবের গায়ের জোর বেশি তারই রাজত্ব চলছে। অর্থাৎ শরীরের গড়নের ওপরেই অনেক কিছু নির্ভর করতো।

নবজীবীয় যুগে এসে দেখা যাচ্ছে, গায়ের জোরের চেয়েও বড় জোর হচ্ছে মস্তিষ্কের জোর।

এবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক্। দেখা যাচ্ছে, জীবন ধারণের তাগিদেই একদল বৃক্ষাশ্রয়ী জীবের দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়ে উঠেছিলো এবং চোখের অবস্থানও গিয়েছিলো বদলে।

স্বাভাবিক নিয়মেই মস্তিষ্কের যে অংশে দৃষ্টিবোধ, সে অংশটি হয়ে ওঠে আরও উন্নত। ফলে বৃক্ষাশ্রয়ী জীবরা নতুন এক ক্ষমতার অধিকারী হয়—সঠিক ভাবে দূরত্ব স্থির করতে পারা।

যে সমস্ত জীব মাটিতে চলাফেরা করে তারা শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়ে যদি সঠিক ভাবে দূরত্ব স্থির করতে না পারে তাহলে বড়জোর শিকারটি ফসকে যাবে।

এর বেশি নয়।

প্রাণে কিন্তু মরবে না।

অথচ বৃক্ষাশ্রয়ী জীবদের জীবনের সংশয় রয়েছে।

এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফিয়ে পড়ার মুহূর্তে তারা যদি সঠিক দূরত্ব ঠিক না করতে পারে তাহলে প্রাণ সংশয় হয়ে পড়বে।

ওদিকে আবার এই বৃক্ষাশ্রয়ী জীবদের জীবন ধারণের তাগিদেই চোখের পলকে ডালে ডালে লাফিয়ে পড়তে হতো। ফলে, দ্রুত মস্তিষ্ক চালনার ক্ষমতা এই জীবদের আয়ত্তে এসে যায়।

আর মস্তিষ্ক চালনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মস্তিষ্ক হয়ে ওঠে আরো উন্নত।

এদের গাছের ডালে চলাফেরা করতে হতো বলে এরা আরও কয়েকটা ব্যাপারে পটু হয়ে উঠেছিলো। যেমন গাছের ডাল আঁকড়ে ধরতে পারা, শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারা ইত্যাদি।

এ ধরনের প্রত্যেকটি কাজের জন্যই মস্তিষ্ক চালনা দরকার। তাই তাদের অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক আরো উন্নত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, এরা সামনের প্রত্যঙ্গ দুটো হাতের মত ব্যবহার করতে পারছে এবং সেই হাতের মুঠোয় লাঠি ধরতে শিখেছে।

ওদিকে লেজের ব্যবহার বিশেষ না থাকায় লেজটি ছোট

হয়ে আসছিলো। একদিন তাও থাকেনি। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এবার এই বৃক্ষাশ্রয়ী জীবটির চেহারার কল্পনা করা যাক।



লেজ নেই।

পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে।

সামনের প্রত্যঙ্গ দুটো ব্যবহার করে হাতের মতো।

এরা বানর হতে পারে।

কিন্তু বানর নয়।

শিম্পাঞ্জী হতে পারে;

ওরাং ওটান হতে পারে;

কোনটাই নয়।

মানুষ হতে পারে।

কিন্তু মানুষও নয়।

পুরোপুরি কোনটাই নয়।

ইংরেজীতে এদের নাম 'অ্যানথ্রোপয়েড এপ্' অর্থাৎ 'মনুষ্য সদৃশ বিশেষ জাতীয় বানর।'

মনুষ্য সদৃশ লেজহীন জাতীয় বানর।

জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত আজকের সভ্য মানুষ তাদের

এই পূর্বপুরুষ 'মনুষ্য সদৃশ বানরের' কথা চিন্তাও করতে পারবে না।

এ কি করে সম্ভব।

পৃথিবীর বিবর্তনের পক্ষে সবই সম্ভব।

প্রাণের জন্মও এই বিবর্তনের জন্যই সম্ভব হয়েছে। আর এই বিবর্তনের জন্যই পৃথিবী আজকের আকারের মানুষকে পেয়েছে।

এই পূর্ব-পুরুষদের অর্থাৎ 'মনুষ্য সদৃশ্য বানরের' সারা গায়ে লম্বা লম্বা লোম।

কানের শেষের দিকটা ছুঁচালো।

লম্বা চোয়ালটা সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে।

মাথাটাও ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে।

যতখানি সম্ভব সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবু পুরোপুরি সোজা নয়।

খানিকটা কুঁজো।

হাঁটু দুটো সামনের দিকে বাঁকা।

এর বেশি সোজা হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর তা এর স্বভাবও নয়। আসলে সে চার হাত পায়ে ভর করেই চলে।

তাছাড়া মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছে এই প্রথম।

প্রাণের তাগিদেই এক সময় মাটি থেকে গাছের ডালে উঠেছিলো। আবার প্রাণের তাগিদেই গাছ থেকে নিচে

নেমে মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

এরাই আদি মানুষ।

অবশ্য একথা ঠিক যে, মানুষের এই পূর্ব-পুরুষকে সুস্পষ্ট-ভাবে চিনে নেয়ার মত প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ জীব-বিজ্ঞানের যাদুঘরে এখন পর্যন্ত মওজুদ নেই।

প্রাণী জগতে মানুষ সবচেয়ে সাম্প্রতিক কালের জীব হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর মাটিতে তন্ন তন্ন করে খুঁজে মাত্র গুটি কয়েক ফসিল-মানুষের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

মানুষের চেয়ে অনেক আগের কালের জীব ডাইনো-সররা পৃথিবীর মাটিতে যতকিছু নিদর্শন রেখে গিয়েছে, মানুষ তাও রাখেনি।

অথবা হয়তো বহু নিদর্শনই রয়েছে।

মানুষ তা খুঁজে পায়নি।

তবু যা পাওয়া গিয়েছে তা অনিশ্চিত বা অনির্দিষ্ট নয়।

এতে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন বিশেষ জাতীয় জীব বিবর্তনের কোন বিশেষ পথে বিকাশ লাভ করে আজকের দিনের মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই জীব-বিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন।

আজও মানুষের অনুসন্ধান বা পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ হয়নি।

মানুষে রূপান্তর

আমরা মানুষ।

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তান।

এ যুগের সবচেয়ে উন্নত জীব।

আমাদের সৃষ্টি রহস্য ও আমাদের পূর্ব-পুরুষদের সম্বন্ধে জানতে চাওয়া তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক।

জীব জগতের ইতিহাসে মানুষের অস্তিত্ব একেবারেই সাম্প্রতিক কালের। মাত্র কয়েক লক্ষ বছর তার বয়স। পৃথিবীর অস্তিত্বকালের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও নগণ্য একটি ঘটনা।

এই নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর ঘটনার মধ্যে মানুষের জন্ম হলেও আজ এই মানুষই সমগ্র পৃথিবীর বরপুত্র। জীব জগতের একচ্ছত্র সম্রাট।

মানুষ আজ জল-স্থল ও আকাশ সর্বত্রই জয় করে নিয়েছে।

আজ আমরা বাস করছি এটমের যুগে।

রকেটের যুগে।

একদিন মানুষ চাঁদকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতো দেবতা হিসেবে। তার স্নিগ্ধ আলোকে মনে করতো পৃথিবীর মানুষের জন্য অনুগ্রহ।

শান্তির প্রতীক ছিলো চাঁদ।

আজ মানুষ এই চাঁদের দেশেও ভ্রমণ করে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে বহাল তবিয়তে। দেখে এসেছে চাঁদের দেশের পাহাড়-পর্বত আর মরু সাগর। চাঁদ পৃথিবীর একটা অংশ থেকে জন্মালেও তা কিন্তু মোটেই পৃথিবীর মত নয়। বাতাস ও পানি না থাকায় উদ্ভিদ ও জীবজন্তু থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যে চাঁদ জানালার পাশে না দেখলে রাজকন্যার ঘুম হতো না, যে চাঁদ না হলে কবির কল্পনা পাখা মেলে না, যে চাঁদের আলো ছাড়া প্রেম জমে ওঠে না, সে চাঁদের বাস্তব অবস্থা জানতে পেরে মানুষ কি আজ সত্যিই খুশি ?

কিন্তু উপায় নেই।

বাস্তবকে স্বীকার করতেই হবে।

চাঁদের মাটিতেও মানুষ আজ তার পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে এসেছে।

যান্ত্রিক দিক দিয়েও মানুষ আজ উন্নতির চরমে পৌঁছে গিয়েছে।

আমেরিকার মানুষ রকেটের সাহায্যে চন্দ্রে পৌঁছেচেন আর রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা মনুষ্যবিহীন রকেট পাঠিয়ে পৃথিবী থেকে তাকে পরিচালনা করে কৃতকার্য হয়েছেন। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক রকেট 'লুনা' চাঁদের মাটিতে নেমে সেখানকার মাটি, পাথর উঠিয়ে নিয়ে আবার নিজে নিজে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এসেছে। এবার যাত্রা শুরু হয়েছে মঙ্গল গ্রহের

দিকে।

বিজ্ঞান আজ মানুষের হাতের মুঠোয়।

ধ্বংসকেও আজ মানুষ তার কল্যাণে নিয়োজিত করার চেষ্টা করছে। যে বিদ্যুতের কয়েক সেকেণ্ডের স্পর্শে মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হয় সেই বিদ্যুৎও আজ মানুষের আজ্ঞাবহ ভৃত্য।

এটমের মত মহাধ্বংসকারী শক্তিও আজ মানুষের আয়ত্তে। আণবিক শক্তিকে মানুষের দৈনন্দিন কাজে লাগাবার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এটমকে ভেঙে শক্তি সংগ্রহের চেষ্টায় মানুষের মস্তিষ্ক আজ নিয়োজিত। এই এটম ভাঙা প্রক্রিয়াতেই শক্তি সংগ্রহ করে সূর্য।

মানুষ যেন আজ সূর্যের সমকক্ষ হতে চললো।

দিনের পর দিন,

মাসের পর মাস এমনি করেই মানুষ চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা মানুষ হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতির একেকটি শক্তি জয় করে মানুষ তার নিজের কাজে লাগিয়েছে।

আজ তারে তারে বিদ্যুৎ ছুটে চলে।

হাজার হাজার মাইল দূরের মানুষের কাছে বার্তা ছুটছে বেতারে। ওয়্যারলেসে। টেলিফোনে।

টেলিভিশনে দূরের মানুষের ছবি দেখতে পাচ্ছি কাছে।

মানুষ উড়ছে আকাশ পথে।

সাত-সমুদ্র আর তেরো নদীর দূরত্ব আজ আর তার কাছে কিছুই নয়।

জল পথে ছুটছে বিরাট বিরাট জাহাজ।

পানির নিচে দিয়েও আজ মানুষের সহজ গমনাগমন।

রেল, বাস এসব তো আছেই।

কল-কারখানার চাকা ঘুরছে অনবরত।

এই যে এতসব কিছু আজ মানুষের আয়ত্তে এসেছে— বিদ্যুৎ শক্তি হয়েছে মানুষের হাতে বন্দী তার বয়স মাত্র সত্তর পঁচাত্তর বছর হবে।

বাষ্পীয় ইঞ্জিন হয়েছে মাত্র শ'তিনেক বছর আগে।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে অত্যন্ত আনাড়ী একটি পাম্প মেশিন তৈরি হয়েছিলো কয়লাখনি থেকে পানি তুলবার জন্য।

কিন্তু উচ্চ মানের পাম্প তৈরি হয় আরও অনেক পরে— ১৭৬৯ থেকে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ এক বিরাট পরিবর্তন ঘটালো।

কয়লার ভেতর সূর্যের যে শক্তি বন্দী হয়ে ছিলো, মানুষ তাকে মুক্ত করে তাপ সৃষ্টি করলো।

তৈরি হলো যান্ত্রিক শক্তি।

এর আগ পর্যন্ত জল-হাওয়ার শক্তিই ছিলো মানুষের সহায়।

তাই দিয়ে কল চলতো।

সাগর পাড়ি দিতো জাহাজ।

তারও আগে, কয়েক হাজার বছর আগে, এই জল হাওয়ার শক্তিকে কাজে লাগাবার কৌশলটিও মানুষের জানা ছিলো না।

তখন পেশীর শক্তিই ছিলো মানুষের সহায়।

মানুষ আর পশুতে তেমন কোন পার্থক্য ছিলো না।

এ সময়ে বুদ্ধিমান, সাহসী ও শক্তিমান মানুষ আর একজন মানুষকে ছলে-বলে-কৌশলে নিজের কাজে লাগাতো। এ ভাবেই সৃষ্টি হয়েছিলো দাস প্রথার।

অবশ্য আজও মানুষ মানুষকে দাস হিসেবে ব্যবহার করে।

তবে তার কৌশলটা একটু আলাদা।

আর একটু ভদ্র।

আধুনিক মানুষ শিক্ষিত ও ভদ্র।

তাই সোজাসুজি আর একজন মানুষকে দাস হিসেবে ব্যবহার করতে তার চক্ষুলজ্জায় বাধে।

এমনি করে যদি আমরা পেছনে চলতে থাকি তাহলে কি দেখবো?

দেখবো, পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষ সর্বপ্রথম অক্ষর আবিষ্কার করেছে মাত্র। এইমাত্র আঁকাবাঁকা অক্ষরে গাছের ছালে বা পশুর চামড়ায় লিখতে চেষ্টা করছে। বলতে গেলে, এখান থেকেই মানব-সভ্যতার আরম্ভ।

আরও আগে।

সভ্যতার নাম গন্ধ নেই।

বর্বর সমাজ।

প্রায় তিন হাজার বছর ধরে মানুষ বর্বর জীবন যাপন করেছে। তারই ভেতর দিয়ে একটু একটু করে মানুষ সভ্য হয়ে উঠেছে।

খনিজ লোহা গলিয়ে লোহার হাতিয়ার তৈরি করাটাই তার শেষ ধাপ।

তার আগে। এশিয়া ভূ-খণ্ডে প্রথম গৃহপালিত পশুর চিহ্ন দেখা যায়। সেচের সাহায্যে মানুষ চাষ আবাদ করতে শেখে।

এরও আগে দেখা যায়, মৃৎশিল্প অর্থাৎ মাটির বাসন কোসন তৈরি করতে শেখে মানুষ।

এ হলো আজ থেকে সাত হাজার বছর আগের কথা।

তারও আগে দেখা যায়, বর্বর সমাজে মানুষের জীবনে যা ছিলো সে সুখ সুবিধাগুলোও মিলিয়ে যাচ্ছে।

সে হলো মানুষের আদিম বন্য অবস্থা।

এ সময়েই মানুষ তীর ধনুক তৈরি করতে শেখে।

শিকার করে খেতে শেখে।

আরও পিছিয়ে গেলে দেখা যাবে, তীর ধনুকও নেই।

তবে মাছ ধরে খেতে শিখেছে মানুষ।

এ সময়েই মানুষ প্রথম আগুন জ্বালাতে শেখে।

তার আগে আগুন জ্বলতো শুধু প্রকৃতির খেয়ালে।

এর আগে গেলে দেখতে পাবো, উলংগ মানুষ।

অসহায় মানুষ।

ক্ষুধার তাড়নায় এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে।

শীতে কষ্ট পাচ্ছে।

অসহায় ভাবে প্রকৃতির খেয়ালে মৃত্যুবরণ করছে।

গুহায় আশ্রয় নিতে গিয়ে বাঘ-সিংহের পেটে চলে যাচ্ছে।

ফলমূল না পেয়ে পোকা মাকড়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।

কাছাকাছি খাদ্য না পেয়ে মানুষ খাচ্ছে মানুষকে।

মৃত পশুর মাংসের ভাগ নিয়ে পশুর সঙ্গে কাড়াকাড়ি করছে।

এমনি অসহায় ভাবে মানুষের কত হাজার বছর যে কেটে গিয়েছে তার ঠিক নেই।

এর সঠিক হিসেব পাওয়ার কোন উপায় নেই।

এ হলো মানুষের শৈশব কাল।

তারও আগে কি ?

অতীতের গহ্বর খুঁড়তে গিয়ে আর বিশেষ কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় না।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, মানুষ নেই।

মানুষ বলে কোন প্রাণী ছিলো না এ জগতে।

তবে লক্ষ লক্ষ বছর আগে গিয়ে সেই লোমশ মনুষ্যাকৃতি

জীবের সন্ধান পাওয়া যায়। যার কথা আগেই বলা হয়েছে।

সারা গায়ে লোম।

বাঁকা হাঁটু

লম্বা চোয়াল।

লেজ নেই।

কুব্জ দেহ।

পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে।

সামনের প্রত্যঙ্গ দুটো ব্যবহার করে হাতের মতো।

আধা-বৃক্ষাশ্রয়ী স্তন্যপায়ী জীব।

গোটা মানব জাতিরই পূর্ব-পুরুষ হলো সেই লক্ষ লক্ষ বছর আগের আনাড়ী জীবটি।

মনুষ্য সদৃশ বিশেষ জাতীয় বানর বা 'অ্যানথ্রোপয়েড এপ'।

৬

গাছ ছেড়ে মাটিতে

লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানুষের এই পূর্ব-পুরুষ 'মনুষ্য সদৃশ বিশেষ জাতীয় বানররা' গাছের ডালে ডালে বাস করতো।

তারপর একসময় খাবারের সন্ধানে নেমে এলো মাটিতে।

ডালে ডালে বেড়াতে, গাছে চড়তে, গাছ থেকে নামতে হাত আর পায়ের কাজ আলাদা।

আর গাছের এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে বেড়াবার জন্য তাদের দ্রুত মস্তিষ্ক চালনার ক্ষমতা আয়ত্তে এসে গিয়েছিলো। ফলে, সে-সময়কার অন্যান্য জীবদের তুলনায় তাদের মস্তিষ্ক উন্নততর হয়ে ওঠে।

এখন মাটিতে নামার ফলে তাদের দেহেও পরিবর্তন

ঘটতে আরম্ভ করলো। অর্থাৎ মাটিতে নেমে তারা আর চার হাত পায়ে চললো না।

চলার প্রয়োজন ছিলো না।

ক্রমেই সোজা হয়ে দু'পায়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো।

অবশ্য আজকের মতো নয়।

তাদের হাঁটু দুটো ছিলো সামনের দিকে বাঁকা।

মাথাটা ঝুঁকে পড়তো সামনের দিকে।

কিন্তু সেই যে তারা দু'পায়ে যথাসম্ভব সোজা হয়ে চলতে লাগলো, তাই হলো এক বিরাট ঘটনা। এরই ফলে 'মনুষ্য সদৃশ বাঁদর' থেকে মানুষে পরিবর্তন হওয়ার গোড়াপত্তন হয়ে গেলো।

তবে কথা হলো। এরা গাছের ডাল ছেড়ে মাটিতেই বা নামলো **কেন ?**

খাবারের তাগিদ

পূর্বে **জীবজন্তুর** ইতিহাসে যে পরিচয় পাওয়া যায়,

তাতে দেখা যায়, সর্বপ্রথম স্তন্যপায়ী জীবদের একটা বিশেষ দল গাছে উঠে পড়েছিলো। মাটিতে অতিকায় জীবজন্তুর দাপটে তারা আর টিকতে পারছিলো না।

পরে আবার ওই বৃক্ষাশ্রয়ী জীবদের একটা বিশেষ দল —মনুষ্য সদৃশ বানররা কেন আবার ভূ-পৃষ্ঠে নেমে পড়লো? তারা তো বেশ আরামেই এ ডালে ও ডালে করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো।

কেন এমনটা হলো?

খাদ্য!

খাবারের সন্ধানেই আবার তারা বিপদ সংকুল ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছিলো।

নতুবা আর চলছিলো না।

বহু অনুসন্ধান আর গবেষণার ফলে পণ্ডিতেরা জানতে পেরেছেন, মাটিতে না নেমে তাদের তখন আর উপায় ছিলো না।

তখনকার দিনে আবহাওয়ার অবস্থা এখনকার মত ছয় ঋতুতে ভাগ করা ছিলো না। অথচ ঋতুভেদ আর পরিবর্তন মোটামুটি আজকের মতই ছিলো।

ঋতু বিভাগটা তখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো যে, বছরের ভেতর কয়েক মাস ধরে গাছে ফল ধরতো না। আর বৃক্ষাশ্রয়ী জীবদের প্রধান আহার ছিলো ওই ফলই।

কাজেই খাবারের সন্ধানে তাদের ছাড়তে হলো গাছের

ডাল। নেমে আসতে হলো মাটিতে

দু'পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা

কিন্তু মাটিতে নেমে খাবার খুঁজতে হলে চারদিকে নজর রাখা চাই।

আরও উঁচু থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকানো দরকার। আশেপাশে অন্য কোন সবল মাংসাশী জীবও সাক্ষাৎ যমের মত ওৎ পেতে থাকতে পারে। ইপ্সিত খাবার ধারে কাছে না থেকে দূরেও থাকতে পারে।

এমনি অবস্থায় দু'পায়ে দাঁড়ানো বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়লো তাদের জন্যে।

দূরে অবস্থিত খাবার অনুসন্ধান করে দেখতে হলে দাঁড়াতে হয়। শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হলেও দাঁড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত নজর রাখা প্রয়োজন।

শুরু হলো দাঁড়াবার চেষ্টা।

ক্রমে ক্রমে সে-চেষ্টায় এরা সাফল্য লাভ করতে আরম্ভ করলো।

দু'পায়ে ভর দিয়ে কোনরকমে দাঁড়াতে সক্ষম হলো।

আবার কোন কোন পণ্ডিত বলেন আর এক কথা। ঋতু পরিবর্তনের ফলে বছরের ভেতর কয়েক মাস ফল পাওয়া যেতো না। আবার হয়তো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জঙ্গলকে জঙ্গলই একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

তাই আর ডাল থেকে মাটিতে নামার প্রশ্ন নয়। ডালই নেই। বাঁচতে হলে যেমন করেই হোক মাটিতেই খাবার জুটিয়ে নিতে হবে।

আর মাটিতে নেমে বাঁচতে হলে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে কোন উপায় ছিলো না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বাঁচার তাগিদেই মানুষের পূর্ব পুরুষদের জীবনে অতবড় একটা পরিবর্তনের গোড়া পত্তন হয়ে গেলো।

হাতের কেরামতি

এবার দেখা যাক, সোজা হয়ে দাঁড়ানোটা অতবড় ঘটনা

কিসে ?

আর পরিবর্তনটাই বা কি ?

সে পরিবর্তন হলোই বা কি করে ?

গাছে যখন বাসা ছিলো, তখন চলার কাজে হাতও লাগতো।

মাটিতে চলার সময় প্রথম প্রথম হাতও ব্যবহৃত হত।

যখন দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হলো, তখন দেখা গেলো হাতের ব্যবহার চলার কাজ থেকে ছাড়া পেয়ে গেছে।

চলার কাজ থেকে মুক্ত হয়ে তবে কি হাত বেকার ঝুলতে লাগলো ? না, অন্য কোন কাজে লেগে গেলো ?

গাছে বাস করার সময়ই এদের হাত ও পায়ের কাজ আলাদা হয়ে গিয়েছিলো ? আগেই বলা হয়েছে, গাছে চড়তে, উঠতে, নামতে হাতের কাজ এক রকম, পায়ের কাজ অন্য রকম। ফলমূল তুলতে ও ধরতে লাগে হাত। পা দিয়ে ওসব কাজ চলা সম্ভব নয়।

অনেক রকমের বানর আবার গাছে বাসা বাঁধে হাত দিয়ে।

শিম্পাঞ্জীরা তো ঝড়-জল থেকে বাঁচার জন্য ডালে ডালে জুড়ে ছাদ তৈরি করে ফেলে। সে-ও ওই হাত দিয়ে। শত্রু এলে হাত দিয়ে ডালপালা বাগিয়ে ধরে। পাথর কিংবা ফল ছুঁড়েও মারে হাত দিয়ে।

তবে মানুষের হাতের সঙ্গে তাদের হাতের আকাশ পাতাল পার্থক্য। কত শত সহস্র বছরের সাধনায় আর চেষ্টায় আজকের মত মানুষের হাত তৈরি হয়েছে।

দিন দিন, একটু একটু করে বেড়েছে হাতের কেরামতি।

প্রকৃতির পরিবর্তন অপ্রয়োজনে হয় না।

জীবজন্তুর পরিবর্তনও এসেছে বাঁচার তাগিদে।

প্রকৃতির নির্মম পরিবেশে, ঝড়-জল আর উত্থান পতনের মাঝে জীবজন্তুর বেঁচে থাকার আকুল প্রয়াস থেকে, ক্রমে ক্রমে বছরের পর বছর, লক্ষ কোটি বছরের সাধনায় নিজেদের একটু একটু করে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করেছে প্রকৃতির নতুন পরিবেশের সঙ্গে।

যারা তা পারেনি, তারা এ ধরার বুক হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। যারা পেরেছে, তারাই টিকে রয়েছে।

মানুষও এই টিকে থাকার দলে।

বেঁচে থাকার প্রয়াসে, বছরের পর বছরের সাধনায় ধীরে ধীরে সে 'মনুষ্য সদৃশ বিশেষ জাতীয় বানর' থেকে আজকের মানুষ রূপে গড়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

মানুষের এই চেষ্টা ধাপে ধাপে এগিয়েছে।

মানুষ ও বনমানুষের হাতের পার্থক্য

বন মানুষের সঙ্গে মানুষের হাতের গড়নে মিল আছে অনেক। মানুষের পেশী, হাড় বা অস্থি যেখানে যা থাকে, যে নিয়মে মানুষের হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া চলে থাকে, ঠিক সেই নিয়ম বন-মানুষের বেলাতেও।

বাইরের আকৃতিটা ছাড়া আর সবই এক।

তবু মানুষ ও বন-মানুষের মধ্যে আশ্চর্য রকমের ব্যবধান রয়েছে। মানুষের সেই শৈশব অবস্থা, যখন মানুষ সবেমাত্র গাছ থেকে ভূমিতে নেমেছিলো, তখনকার মানুষ যা করতে পারতো তা কি কোন বন-মানুষ করতে পারে ?

পারে না।

বানর জাতীয় কোন প্রাণী হাজার চেষ্টা করেও একটা যেমন তেমন পাথরের ছুরি তৈরির কল্পনাও করতে পারে কি ?

না। তা অসম্ভব।

পারে না।

তবু ওই 'বানর জাতীয়' প্রাণী থেকেই আজকের সভ্য মানুষের আবির্ভাব হয়েছে।

এই যে বানর থেকে মানুষ, এই পরিবর্তন হতে কত

সময় লেগেছিলো—কত হাজার বছর লেগেছিলো তা আজ সঠিক করে বলা সম্ভব নয়।

তবে এটা ঠিক, প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলো।

খুব ধীরে ধীরে, হাজার হাজার বছর সময় লাগলেও মানুষ চেষ্টা করে সফল হয়েছিলো।

আর তা শুধু হয়েছিলো জীবন রক্ষার তাগিদে।

নিজেকে বাঁচাবার আকুল প্রয়াস থেকেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলো মানুষ।

বাঁচার এই যে সংগ্রাম, তার নিত্য নতুন কৌশল আবিষ্কার করতে গিয়েই তাকে মাথা খাটাতে হয়েছিলো।

নিজের অজান্তেই মানব ইতিহাসের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলো মানুষ। চিন্তা ভাবনার প্রয়োজনে মাথার কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিলো।

মানুষের এই 'গুণটুকু' অর্থাৎ চিন্তা ভাবনার সুযোগটুকু অর্জন করার পর পরই সে বুঝতে পেরেছিলো কঠোর কঠিন প্রকৃতির বুকে টিকে থাকতে হলে তাকে সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে।

আর তা অর্জন করতে হবে নিজের চেষ্টায় ও শক্তিতে। তা না পারলে তাকে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। প্রকৃতির বুক থেকে হারিয়ে যেতে হবে চিরতরে। বিরাট বিরাট জন্তু জানোয়ার চোখের সামনেই প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে

না পেরে ধরার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো।

তাই, সেদিনের মানুষ সাবধান হয়ে গেলো।

এই সাবধান হতে পারল সে মস্তিষ্ক পরিচালনার সুযোগ পেয়ে। এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

মস্তিষ্কের এই বিশেষ ক্ষমতা অর্জনের পর মানুষ বুঝতে পারলো, তাকে বাঁচতে হবে তাকে এগিয়ে যেতে হবে আত্মরক্ষা ও খাবার সংগ্রহে নতুবা আর আর জীব জন্তুর মত তারও মৃত্যু সুনিশ্চিত।

বেঁচে থাকার প্রয়াসেই তখন সে এখানে সেখানে হাত লাগাতে আরম্ভ করলো। তখনকার সেই পশুর হাতই একদিন কারিগরের যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হলো।

তৈরি করলো আনাড়ী ছুরি।

মানুষের তৈরি প্রথম অস্ত্র।

এই যে একটা অঘটন ঘটাতে পারলো তা দিয়েই সেই আদিম মানুষ, পূর্ব-পুরুষের দল থেকে আলাদা বলে চিহ্নিত হয়ে গেলো।

অবশ্য এই 'ক্ষমতাটুকু' অর্জন করতে তাকে কত হাজার বছর চেষ্টা ও সাধনা করতে হয়েছিলো তা কে জানে।

এই অস্ত্র তৈরি থেকেই মানুষ তার আনাড়ী জীবন কাটিয়ে উঠতে আরম্ভ করলো।

মাথা ও হাতের ব্যবহার একই সঙ্গে শুরু হলো।

এতদিন যে হাত ছিলো ফল তোলার, ফল ধরবার,

পাথর তুলবার, সেই হাত পরিণত হলো সত্যিকার হাতে।

দিন দিন সে হাতের ক্ষমতা বেড়ে চললো।

একদিনের সেই আনাড়ী হাতে শক্ত করে ধরতে শিখলো নিজের তৈরি পাথরের অস্ত্র।

জয় যাত্রা

এবার আর তাকে পায় কে?

তার চাইতে দশগুণ বড় জীবজন্তুও আজ তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে অক্ষম হয়ে পড়লো। অনেকটা সহজ হয়ে পড়লো খাবার সংগ্রহ। আজ অস্ত্র তার হাতে। জীব জন্তুকে সহজেই শিকার করা যাচ্ছে।

পশু মানুষের সমাজে শুরু হয়ে গেলো নতুন বিপ্লব।

দিন দিন বাড়তে লাগলো হাতের কেরামতি।

পুরুষানুক্রমে হাতের শ্রমের ব্যবহার বাড়তে লাগলো। সভ্যতার দিকে ধাপে ধাপে এগোতে আরম্ভ করলো মানুষ।

মানুষের এই শ্রমের পেছনেই রয়েছে দুনিয়ার যত ধন-

দৌলত। একদিন যে শ্রম মানুষ শুরু করেছিলো আত্মরক্ষার তাগিদে, তাই তাকে গড়ে তুললো আরাম-আয়েসী করে। একদল অপর দলের শ্রমের উপর তাদের বসিয়ে নিজেরা হয়ে উঠলো সুখ আর সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ।

অথচ একদিন মানুষ এই শ্রমের কথা ভেবেছিলো নিতান্ত ব্যক্তিগত ভাবে। অস্ত্রও তৈরি করেছিলো নিজের আত্মরক্ষা ও জীবিকা অর্জনের জন্য।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আজকের মানুষের এই যে উন্নতি, মানুষ যে আজ সভ্যতার চূড়ান্তে পৌঁছেছে—অসীম ক্ষমতা অর্জন করেছে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, সবার মূলে রয়েছে ওই শ্রম।

আর শ্রমের প্রধান ও মূল হাতিয়ার হলো হাত।

মস্তিষ্কে যা কিছু ভাবনা আসুক বা যে কোন পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে হলে শেষ পর্যন্ত তাকে হাতের সাহায্য নিতেই হচ্ছে।

মানুষের এই হাতের ব্যবহার শেখার পরই তার সব কিছুর উন্নতি হয়েছে।

হাত দিয়ে প্রধানতঃ শ্রমসাধ্য কাজই করা হয় অর্থাৎ শ্রমের প্রাণই হলো হাত।

আর এ হাত গড়ে উঠেছে শ্রমেরই ফলে।

জীবন রক্ষার তাগিদে।

আজ যে একটা আনাড়ী থাবা মানুষের হাতে পরিণত

হয়েছে তা কিন্তু অত সহজে হয়নি।

শত শত বছরের সাধনা আর প্রয়োজনের তাগিদে--নিজের জীবন রক্ষার সংগ্রামের ফলেই ধীরে ধীরে তা বর্তমান রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। আর এ সম্ভব হয়েছে শ্রমেরই ফলে। বলতে গেলে, এই শ্রমই সৃষ্টি করেছে মানুষকে।

মানুষের জীবন তো শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকাই নয়।

অনেক কিছু।

শিল্প-সাহিত্য ও সংগীত রয়েছে মানুষের।

রয়েছে কাব্য ও দর্শনের গরিমা।

রয়েছে সৌন্দর্যের অনুভূতি ও সৃষ্টি প্রয়াস।

রয়েছে মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান আর কলকারখানার নব নব সৃষ্টি।

এ সবই হয়েছে অধ্যবসায় আর শ্রমের ফলে।

'মনুষ্য সদৃশ বানর' থেকে মানুষ হওয়ার এই যে চেষ্টা তাকেই বলা হয় শ্রম।

কঠোর সাধনা আর অকল্পনীয় পরিশ্রমের ফলেই মানুষ মানুষ হতে পেরেছে। মানুষের জীবনের এই যে বহুমুখী বিকাশ ও বহুমুখী অস্তিত্ব, তার সব কিছুর মূলেই রয়েছে ওই শ্রম।

আজকের দুনিয়ায় মানুষ যে আধিপত্য গড়ে তুলেছে—পৃথিবীর হিংস্র জীব জানোয়ারকে হটিয়ে দিয়ে সবটুকু নিজেদের দখলে নিয়েছে, তার মূলে ওই শ্রমেরই কেরামতী।

আর ওই শ্রমের প্রধান হাতিয়ার হাত থেকেই এসেছে সব। বিশেষ জাতীয় মনুষ্য সদৃশ বানরের আনাড়ী হাত ক্রমে ক্রমে নানা কাজের চাপে দক্ষতা অর্জন করেছে।

বদলেছে হাতের গড়ণ।

পশুর থাবা থেকে হয়েছে মানুষের হাত।

প্রথম দিকে সেই আনাড়ী হাত পাথর ভাঙ্গা, পাথর ছোঁড়া, পোকা-মাকড় ধরা এসব কাজই করতো। ক্রমে তাদের আরও নতুন নতুন রকমের কাজ করতে হয়েছিলো। সে সব নতুন নতুন কাজ করতে গিয়ে হাতকে একটু একটু করে কাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিলো।

খাপ খাইয়ে নেবার এই অদম্য চেষ্টার ফলে নতুন নতুন কাজের উপযোগী হয়ে তাদের হাত গড়ে উঠেছিলো। দেখা দিয়েছিলো নতুন নতুন পেশী ও সন্ধি-বন্ধনী। তার এক একটা নতুন পেশী বা সন্ধি-বন্ধনী লাভ করতে হাতের নিশ্চয় শত শত বছরের অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়েছিলো।

সার্থক হয়ে উঠেছিলো মানুষের এই প্রচেষ্টা।

প্রয়োজনের তাগিদে সে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছিলো। ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিলো আধুনিক মানুষে।

গাছ থেকে মাটিতে নামার ফলে এবং প্রকৃতির ঘন ঘন পরিবর্তনে সেই আনাড়ী মানুষের জীবন যাত্রাও ক্রমে কঠিন হয়ে উঠছিলো।

ফলে খাবার ও আশ্রয় সংগ্রহ করার নতুন নতুন উপায়

মানুষকে খুঁজে বের করতে হলো।

এমনি করেই চেষ্টা করে আসছে মানুষ।

আজও মানুষের সেই চেষ্টা তথা বাঁচার সংগ্রাম শেষ হয়নি।

জন্মলগ্ন থেকেই সে খাবার ও আশ্রয় সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করে আসছে।

তাই তাকে প্রথমে হাত লাগাতে হয়েছে নানা সম্ভব অসম্ভব কাজে। নানা কাজে দক্ষতা অর্জন করতে হয়েছে।

ফলে আরো উন্নত হয়েছে হাত।

এমনি করেই বহু চেষ্টা, সাধনা আর প্রয়োজনের তাগিদে ঘটেছে হাতের ক্রম বিকাশ।

গড়ে উঠেছে আজকের সভ্য মানুষের হাত।

মস্তিষ্ক ও হাত

কাজেই দেখা যায়। সেই বিশেষ জাতীয় বানর থেকে মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার মূলে রয়েছে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়।

আর তাকে সাহায্য করেছে মস্তিষ্ক ও হাত।

যা তাকে প্রকৃতির আর আর সন্তান সন্ততি থেকে আলাদা করে নিয়েছে। অন্যান্য জীবজন্তু থেকে কম শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়েছে—হটিয়ে দিয়েছে পশু শক্তিকে। রাজত্ব করতে পারছে পৃথিবীর বুকে।

অবশ্য এই হাত বা মাথা একাই একটা স্বাধীন বস্তু নয়।

মানুষের দেহটাকে বলা যায়, বহু অংগ প্রত্যংগের একটি পরিবার।

তার একজন সভ্য হলো হাত।

অপরজন মাথা।

তবে মাথাটাই হলো হেড অফিস বা প্রধান কেন্দ্র।

যাদের মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ হেড অফিস অচল, তাদের অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ সম্বন্ধে কোন বোধ নেই। হাত পুড়ে গেলেও সে ব্যথা পাবে না। বুঝতেই পারবে না যে, তার হাত পুড়ে যাচ্ছে। এজন্যেই দেখা যায় অনেক পাগলের কোন বোধ শক্তি নেই। কোন অংগ কেটে গেলেও তার তেমন কোন চাঞ্চল্য থাকে না।

মানব দেহের প্রধান পরিচালনা কেন্দ্র হলো মস্তিষ্ক। আগুনের ছ্যাঁকা হাতে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই হেড অফিসে (মাথায়) ফোন যায় অর্থাৎ সংকেত পাঠানো হয়, হেড অফিস হুকুম দেয়—হাত সরাও। আগুনে জ্বলে যাচ্ছে। অমনি হাত সরে যাবে।

মনের দেহের যতটি কেন্দ্র রয়েছে, তার সবার সঙ্গেই মাথার যোগাযোগ রয়েছে।

অবশ্য একা কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

দেহের একটা অংগের মৃত্যুতে গোটা দেহটারই মৃত্যু ঘটতে পারে।

একটার সঙ্গে আর একটার অঙ্গাঅঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে। একটার ভালো হলে বা বিকাশ ঘটলে তাতে গোটা দেহটারই উপকার হয়।

বিকাশ ঘটে।

তা আবার: বশ নিয়ম মেনে চলে।

এমনি সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, দেহের একটা অংগের সঙ্গে অন্য অংগের তেমন সম্পর্ক নেই। আসলে কিন্তু দেহের একটা অঙ্গের সঙ্গে অন্য কোন একটা অঙ্গের রূপ-গুণ, আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে অন্য কোন একটা অঙ্গের রূপ-গুণ, আকৃতি প্রকৃতি একেবারে বাঁধা। তার মানে এই নয় যে, দুইয়ের আকৃতি প্রকৃতি এক।

কিন্তু একের পরিবর্তন অন্যেরও পরিবর্তন ঘটায়। তা সে ভালোর দিকেই হোক বা খারাপের দিকেই হোক।

মনুষ্য সদৃশ বানর থেকে মানুষের রূপান্তরের ব্যাপার-টাতেও ওই অঙ্গাঅঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে। একটা অংগের বিকাশে অন্য অংগ উন্নত হয়েছে। আবার তার উন্নতিতে

অন্যটা আরো ভালো হয়ে গড়ে উঠেছে। এভাবে গোটা দেহটারই পরিবর্তন ঘটে ঘটে বর্তমানের মানুষ রূপ লাভ করেছে সেদিনের সেই 'মনুষ্য সদৃশ বানর'।

৭

মস্তিষ্কের বিকাশ

এবার মূল কথায় ফিরে আসা যাক।

সোজা হয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই কি মনুষ্য সদৃশ বানর, মানুষ হয়ে গেলো ?

তাই হলো।

তাই হয়েছে।

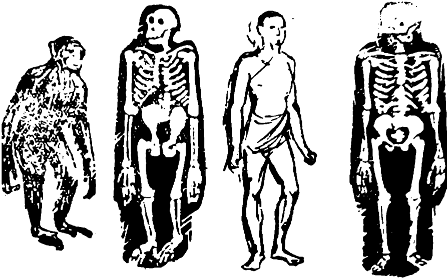
তবে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই নয়।

ওটা হলো গোড়াপত্তন।

মনুষ্য রূপ লাভের প্রথম ধাপ বা প্রথম পর্যায়।

মনুষ্য সদৃশ বানর যেদিন মাটিতে নেমে সোজা হয়ে চলবার চেষ্টা করতে লাগলো, তারই জন্য তার দেহে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হলো।

মানুষ হওয়ার জন্য সর্ব প্রথম যে গুণটুকু প্রয়োজন তারই গোড়াপত্তন ঘটলো। সোজা হয়ে দাঁড়াবার ফলে ঘটলো মস্তিষ্কের পরিবর্তন।



গরিলার দেহ | গরিলার কঙ্কাল | মানুষের দেহ | মানুষের | কঙ্কাল

হাতকে নিজের কাজে ব্যবহার করতে শিখলো মানুষ। পরিবর্তন হলো বানরের হাত থেকে মানুষের হাতে।

এসব কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

এবার মস্তিষ্কের পরিবর্তনটা আরো বিশদ ভাবে আলোচনা করা যাক। অন্যান্য জীবজন্তর তো পরিবর্তন ঘটে না! মানুষের কি করে ঘটলো?

কেন ঘটলো?

কী এমন কারণ লুকিয়ে ছিলো এর পেছনে ?

অবশ্যই কারণ ছিলো। সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টার ফলেই এতবড় একটা পরিবর্তন ঘটে গেলো।

সেই প্রথম মনুষ্য সদৃশ্য বানর বা 'অ্যানথ্রোপয়েড এপ'রা সোজা হয়ে চলবার চেষ্টার ভেতর দিয়ে দেহটা ক্রমে সোজা করে তুলতে লাগলো। মাথাটা না ঝুঁকিয়ে সোজা রাখার চেষ্টা চলতে লাগলো।

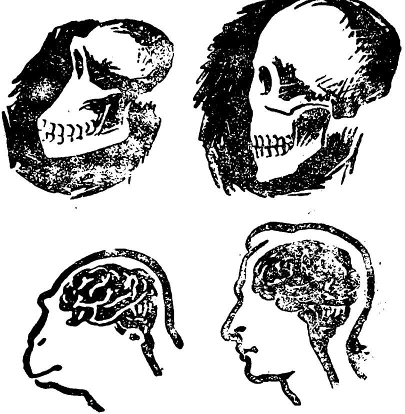
ফলে দেহে দুটো বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেলো।

মাথার খুলির নিচেকার যে গর্তটা দিয়ে মেরুদণ্ড গিয়ে মস্তিষ্কে যুক্ত হয়, সেই গর্তটা ক্রমে সামনের দিকে এগিয়ে এলো।

হাতের কবজির গাঁট মাটিতে ফেলে চলতে গেলে মাথাটা তো সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতো। এবং সেই ঝুঁকে পড়া মাথাটাকে জায়গামত বা সঠিক অবস্থানে ধরে রাখার জন্য ঘাড়ের পেছনটায় অনেকটা পেশীর প্রয়োজন হতো।

এখন মাথাটা যতই সোজা হতে লাগলো, সেই পেশীর প্রয়োজনও একটু একটু কমে যেতে লাগলো। মাথার খুলির নিচেকার এই গর্তটার নাম মহা বিবর। এই গর্ত-টার জায়গাটা বদল হলো। একটু একটু করে সরে যেতে লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের পেছনকার পেশীটিও কমে গেলো। ফলে মস্তিষ্কের বিকাশের অনেক সাহায্য হলো।



গরিলার মাথা   মানুষের মাথা

মস্তিষ্কের বিকাশ বা উন্নতিতে মানুষ নিজের ভালো মন্দের চিন্তা ভাবনা করতে শিখলো। তখনকার প্রকৃতির নতুন নতুন বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন

করে জীবন যুদ্ধে টিকে থাকতে চেষ্টা করতে লাগলো।

রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করলো, পশুর মস্তিষ্ক থেকে মানুষের মস্তিষ্কে। কোন একটা জিনিসকে প্রয়োজন মত কাজে লাগাবার ক্ষমতাও এলো এরই ভিতর দিয়ে। এই যে, কোন কিছুকে দেখে বোঝা আর বুঝে তাকে কাজে লাগানো, এরই ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে মানুষের সেরা শক্তি।

বিচার বিবেচনার শক্তি।

যুক্তি দেবার ক্ষমতা।

নতুন বিষয়ে উদ্ভাবনের চিন্তা ধারা।

এরও প্রভাব গিয়ে পড়লো মস্তিষ্কের ওপর।

চোখে দেখা, কানে শোনা, স্পর্শে অনুভব করা, এ সবকিছুর সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগ রয়েছে।

ওই দেখা-শোনা, জানা ও বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই নানা জিনিসকে নানা কাজে লাগাবার চেষ্টা চলেছে। হাতকে প্রয়োজনে কত ভাবে ব্যবহার করতে হয়েছে। এরই ভেতর দিয়ে একের ওপর অন্যের প্রভাবে, অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের (The law of correlation of growth) ফলে মানুষের প্রতিটি অঙ্গই পশুর অঙ্গ থেকে ধীরে ধীরে—একটু একটু করে মানুষের অঙ্গে রূপান্তরিত হতে হতে আজকের জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত আধুনিক মানব সন্তানের জন্ম।

মানুষের এই আধুনিক রূপ একদিনে হয়নি।

কয়েক বছরে হয়নি।

হাজার হাজার বছরের সাধনা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন পড়েছে।

মানুষের মস্তিষ্কের উন্নতির ফলে সে তার অভিজ্ঞতাকে মনে রাখার—একে বিচার বিশ্লেষণ করে সঠিক পথে এগোবার ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলো। মানব জীবনে এর দাম যথেষ্ট বেশি।

ভালো মন্দের অভিজ্ঞতা মানুষ তার পরবর্তী সন্তান সন্ততিদের বুঝিয়ে যাবার ফলে পরবর্তীরা আরো সাবধান হওয়ার সুযোগ পেলো। এরা আর পূর্ববতীদের ভুল পথে পা না বাড়িয়ে ভালোটুকুকে আরো ভালো করার চেষ্টা করতে লাগলো।

মানুষের এই যে জ্ঞানটুকু—এটাই মানুষকে করেছে মানুষ। তাকে জীবন যুদ্ধে রেখেছে টিকিয়ে। প্রকৃতির কঠোর নির্মম মরণ ছোবলকেও সে সহজে এড়িয়ে যেতে পেরেছে।

এবং শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে।

প্রকৃতির অন্যান্য সন্তান সন্ততির মধ্যে এখানেই সে আলাদা।

অনন্য।

হাতের আরও কেরামতী

এবার দেখা যাক চলাফেরার কাজ থেকে হাত ছাড়া পাবার আগে কি ছিলো মানুষের অবস্থা ?

তখন মানুষকে চতুষ্পদ জন্তুর মত চলার সময় হাত এবং পা দুটোকেই ব্যবহার করতে হতো। ফলে খাবার জিনিস টুকরো করা, কিছু একটা ধরা, কিংবা কিছু ছিঁড়ে ফেলা এসব কাজ করতে হতো দাঁত দিয়ে চোয়ালের জোরে।

কিন্তু মানুষ হাতের ব্যবহার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চলাফেরার কাজ থেকে মুক্ত হয়ে গেলো।

আর এ সমস্ত কঠিন কাজের ভার নিয়ে নিলো হাত।

এতে দাঁত আর চোয়ালের কাজের চাপটাও কমে গেলো।

মাথার খুলির ওপরে যে পেশী ছিলো তার চাপও কমে গেলো।

এ সব কিছুরও একটা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে।

কাজ বদল হওয়ার ফলে, মাথার সংস্থানই বদলে গেলো।

শক্ত কাজ করার দায় থেকে চোয়ালটা রেহাই পেয়ে, মাথাটা এমন এক অবস্থায় এলো, যাতে খুলির ভেতর বেশি মস্তিষ্ক বস্তুর জায়গা হয়।

বেশি মস্তিষ্ক বস্তু হওয়ার ফলে মনুষ্য সদৃশ বানরের

মস্তিষ্ক থেকে মানুষের মস্তিষ্কে পরিণত হয়ে গেলো।

চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা আর জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায় নিয়োজিত হলো মানুষ। দিন দিন পরিণত হলো মস্তিষ্ক।

হাত, মাথা, চোখ কান এদের প্রত্যেকেই অপরের শক্তি বিকাশে সাহায্য করেছে।

একক কেউ নয়।

দেহের প্রতিটি অংগই পরস্পরের একান্ত বিশিষ্ট বন্ধু। আর পরস্পরের সহযোগিতাতেই গোটা দেহটা মানুষ হয়ে উঠেছে।

দলবদ্ধ হলো মানুষ

কিন্তু দেহটা মানুষের মত হলেই তো হলো না।

তাকে বাঁচতে হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে।

অহরহ তাকে অন্যান্য জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়েছে।

আজো হচ্ছে।

ভবিষ্যতেও প্রকৃতির নানা নির্মম আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে যেতে হবে।

এজন্যই মানুষে মানুষে সহযোগিতার প্রয়োজন।

এজন্যই তাকে দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে হয়েছে।

রাখতে হয়েছে একের সঙ্গে অপরের ভাব।

আমাদের সেই গেছো পূর্ব পুরুষ মনুষ্য সদৃশ বানররাও দলবদ্ধ হয়ে বাস করতো।

এই দলবদ্ধ হয়ে বাস করার সুবিধা অনেক।

তখনকার দিনে অন্যান্য জীবজন্তুর চাইতে দৈহিক শক্তিতে অনেক ছোট হয়েও জীবন বাঁচাবার জন্য তাকে অনেক বেশি শক্তিশালী জীবকে শিকার করতে হতো। আবার তার চাইতে অনেক বেশি হিংস্র ও শক্তিশালী জীবের আক্রমণ থেকেও তাকে বাঁচতে হতো।

হাতের মুক্তির পর শ্রমের ভেতর দিয়ে তার অভিযান ও প্রচেষ্টা শুরু হয়। ধীরে ধীরে—এক পা এক পা করে মানুষ সফলতা লাভে এগিয়েছে। আর তার এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আরো নতুন কিছু করার প্রচেষ্টায় মেতে উঠেছে। এসব কাজ করতে গিয়ে তাকে নানা সফলতার ও বিফলতর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছে। ঠেকে শিখতে হয়েছে।

পরবর্তীরা তার এই সফলতার ও বিফলতার অভিজ্ঞতা-

টুকু পুরোপুরি নিজের কাজে লাগিয়ে আরো এগিয়ে গিয়েছে।

আরো নতুন নতুন কাজে তাকে নেমে পড়তে হয়েছে।

এসেছে বিফলতা।

এসেছে ভয়ানক তিক্ত অভিজ্ঞতা।

হয়তো তাকে মৃত্যুও বরণ করতে হয়েছে।

তবু মানুষ পিছিয়ে যায়নি।

এগিয়েছে।

আরো বেশি করে পরিশ্রম করেছে।

চেষ্টা করেছে।

নতুন অভিজ্ঞতার দরুন তাকে শ্রম করার ধরন ধারনও বদলাতে হয়েছে।

যে পথে সফলতা আসতে পারে, সে পথেই তাকে এগোতে হয়েছে।

দৈহিক শক্তিতে প্রকৃতির দুর্বল সন্তান মানুষ।

তাকে বাঁচতে হবে।

নিষ্ঠুর শত্রুর নিকট হতে আত্মরক্ষা করতে হবে। তাই তাকে হতে হয়েছে দলবদ্ধ।

বের করতে হয়েছে নতুন নতুন বুদ্ধি।

নতুন নতুন পথ ও পরিকল্পনা।

অবশ্য সবই খাবারের জন্য।

এই খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে এমন সব কাজ এসে জুটেছে, যাতে এক সঙ্গে অনেককে হাত লাগাতে হয়।

যেমন, বুনো ঘোড়ার পালকে তাড়া করে গর্তে ফেলবার কাজটা। কিম্বা ম্যামথ জন্তুটার যাতায়াতের পথে গর্ত খুঁড়ে ডাল-পাতা দিয়ে লুকিয়ে তাকে শিকার করার কাজটা।

এসব কাজ একা হয় না।

অনেকের দরকার।

আবার অনেকে মিলে একটা কাজ একই সঙ্গে করতে গেলে শৃঙ্খলারও দরকার হয়।

সবাই মিলে কাজ করার সুবিধাটাও সবার কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একা একটা বড় জন্তুকে শিকার করার মত যোগ্যতা মানুষের ছিলো না।

তাছাড়া হঠাৎ কোন হিংস্র জন্তুও তাকে আক্রমণ করে বসতে পারে। আক্রান্ত হয়ে মানুষ প্রাণ দিয়ে বুঝেছে, এভাবে একা থাকা তাদের চলবে না।

দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হবে।

মুখে এলো ভাষা

দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে হলে বা শত্রুকে দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করতে হলে নিজেদের মধ্যে একটা ভাব বিনিময় ও প্রস্তুতি সংকেত বা আক্রমণের ইঙ্গিত থাকার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে, পরস্পরের মধ্যে কিছু বলা-কওয়া বা আদেশ নির্দেশের।

শুরু হলো মানুষের কথা বলার চেষ্টা।

কিন্তু একবারের চেষ্টাতেই তো আর কথা বলে উঠতে পারেনি সেই আদিম মানুষ! প্রথম প্রথম অঙ্গভঙ্গী করে বা কোন দ্রব্য দেখিয়ে অথবা কোন প্রতিকৃতির সাহায্যে নিজেদের ভাব বিনিময়ের চেষ্টা করেছে। কণ্ঠে ফুটে উঠেছে বোবা মানুষের মত অবোধ্য অস্ফুট স্বর।

বছরের পর বছর আপ্রাণ চেষ্টার ফলে একটু একটু করে বদলেছে মানুষের অপরিণত কণ্ঠ। ক্রমে সেই কণ্ঠে সৃষ্টি হলো স্বর। তারপর আরো চেষ্টার ফলে সেই কণ্ঠ ক্রমে আরও স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করার মত উপযুক্ত হয়ে উঠলো।

আর এ চেষ্টা তাকে করতে হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে।

অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে যারা খুব উঁচু দরের, তাদের

যা কিছু প্রয়োজন তা প্রকাশ করার জন্যে স্পষ্টোচ্চারিত ভাষার প্রয়োজন হয় না।

কথা বলার তাগিদ তাদের আসে না।

কথা বলতে না পারার যে অক্ষমতা, সে বোধও তাদের নেই। আবার মানুষের ভাষা বোঝারও তাদের প্রয়োজন নেই।

অবশ্য পোষ মানলে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়।

ঘোড়া ও কুকুর মানুষের সংস্পর্শে এলে তাদের পরিবর্তন ঘটে। উন্নতি হয় তাদের শ্রবন শক্তির। বুঝতে শেখে মানুষের ভাষা। তবে এদের বোধশক্তির অভাবের দরুন ধরা-বাঁধা গণ্ডির বাইরে এরা বিশেষ কিছু বুঝতে পারে না।

কিন্তু মানুষের ব্যাপারটা হলো আলাদা।

মস্তিষ্কের উন্নতির দরুন এদের বিশেষ বোধশক্তির জন্ম হয়েছে—বুঝতে শিখেছে নিজের ভালোমন্দ ও বিচার বিবেচনা। পরিহার করে চলতে শিখেছে তার পক্ষে অহিতকর কাজকে।

আর অনুসরণ করেছে মঙ্গলকে।

এটাই মানুষকে গড়ে তুলেছে মানুষ করে।

এরই জন্য—মানুষের বোধশক্তির উন্নতির দরুনই কথা বলার প্রয়োজনীয়তা সে উপলব্ধি করে তারই সাধনায় নিয়োজিত হয়েছে।

ধীরে ধীরে নিজের প্রয়োজন মাফিক গড়ে উঠেছে

মস্তিষ্ক—কণ্ঠের বিকৃত শব্দ একসময় হয়ে উঠেছে মধুর।

এরই ফলে এলো মানব সমাজের নবযুগের সূচনা।

কথা বলতে পারার গুণটুকু অর্জন করার পর একজন মানুষ আর একজন মানুষের সঙ্গে মনের ভাবের আদান প্রদান আরম্ভ করলো। শিকার করতে—বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে বা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে আর কোন অসুবিধা হলো না। পূর্বের ইঙ্গিত-ময় আদেশ নির্দেশে যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো তার আর কোন কারণই রইলো না। দলবদ্ধ হয়ে সঠিক কাজে নেমে পড়তে পারলো।

অবশ্য আজকের আধুনিক মানুষের কথার সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে সে সময়ের কথার বা ভাষার কোন তুলনাই হয় না। প্রথমে হয়তো একটা বিশেষ অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে বিশেষ কোন বিকৃত ধ্বনিই ছিলো মানুষের কথা বলার প্রথম শব্দ বা ভাষা। তারপর ধীরে ধীরে প্রয়োজনের তাগিদে একটু একটু করে মানুষের ভাষায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের ভেতর দিয়ে আজকের মানুষের ভাষা তৈরি হয়েছে।

এর ভেতরও রয়ে গিয়েছে পার্থক্য।

একই মানুষ, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষা।

বিভিন্ন শব্দ বা বর্ণ পরিচয়।

এর কারণ কি?

তাও লুকিয়ে রয়েছে আদিম মানবের ইতিহাসের পেছনে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করতো। আজো করে।

ওই দলবদ্ধতা আবার নিজেদের মধ্যেই বিশেষ করে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ নিজেদের সন্তান সন্ততিদের নিয়েই একটা গোষ্ঠি তৈরি হয়। সেই গোষ্ঠি থেকে একজন নর ও একজন নারী বের হয়ে গিয়ে আর একটা গোষ্ঠির গোড়াপত্তন করে বা এক গোষ্ঠির লোকের সঙ্গে আর এক গোষ্ঠির বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে যে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে, তাদের নিয়ে সবাই মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করে।

এদের আচার ব্যবহার চালচলন প্রায় এক।

একজনের আদেশ নির্দেশে চলে বলে তাদের মধ্যে একই রীতি নীতি অনুসৃত হয়। ফলে তাদের মধ্যে ভাষার বা প্রথম কথা বলার সংকেত একই রকম হয়েছিলো।

তাই এদের ব্যবহৃত সংকেতগুলোই পরবর্তী কালে এক একটা ভাষার জন্ম নিয়েছে—গোষ্ঠির পরিবেশ ও আঞ্চলিকতার ওপর নির্ভর করে।

ভাষার প্রকৃত প্রয়োজন হলো পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়। প্রাকৃতিক কারণেই তাই ওই ভাষার রূপ ও বর্ণমালা আলাদা।

মানুষের মুখে যেদিন কথা ফুটলো সেদিন থেকেই মানুষ দ্রুত উন্নতি করতে আরম্ভ করলো।

কথা বলতে পেরেই কি মানুষ খুশি হয়েছে?

না। তা নয়।

মানুষের কুষ্ঠিতে তা লেখা নেই।

কোন একটা বিরাট অগ্রগতির পরও সে থেমে যায়নি।

এগিয়ে গিয়েছে।

এগিয়ে গেছে আরো অগ্রগতির উদ্দেশ্যে।

এজন্যেই মানুষ হয়েছে মানুষ।

আর এজন্যেই পৃথিবীর অন্যান্য জীবজন্তুর চাইতে মানুষ আলাদা।

মানুষ প্রথম যখন কথা বলতে পারলো, তখন সেই আনাড়ী ভাষাকে বা বিকৃত শব্দকে একটু একটু করে সুবিধা অসুবিধার বিচার বিবেচনা করে এগিয়েছে—পুরাতন রীতি নীতিকে বিসর্জন দিয়ে সময়োপযোগী নতুনকে সমর্থন জানিয়ে কাজে লাগিয়েছে।

তারপর 'মানুষ' হওয়ার জন্য আরো সাধনা করেছে।

অবশ্য এ সব কিছুর পেছনে রয়েছে জীবন রক্ষার তাগিদ। প্রাণকে আগে বাঁচাতে হবে। আর প্রাণকে বাঁচাতে গিয়ে তাকে যথাসাধ্য শ্রম করতে হয়েছে। শ্রমের ভেতর দিয়েই তাকে বাঁচার নিত্য নতুন কৌশল আবিষ্কার করতে হয়েছে।

ফলে নিজের অজান্তেই তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। যদিও এই পরিবর্তন ঘটেছে লক্ষ লক্ষ বছরের সাধনায়।

৮

গড়ে উঠলো সমাজ

'মনুষ্য সদৃশ বানর' গাছ থেকে একদিন নেমেছিলো জীবন রক্ষার তাগিদে। তারপর জীবন রক্ষার জন্যই তাকে সাধনা করতে হয়েছে।

পরিশ্রম করতে হয়েছে।

হয়েছে মানুষ।

ক্রমে তার এসেছে চিন্তা শক্তি।

এসেছে বিচার বিবেচনার শক্তি।

আত্মরক্ষার জন্যই তার বোবা মুখে ফুটে উঠেছে ভাষা।

তারপর?

তারপরও তার সংগ্রাম শেষ হয়নি।

অহরহ তাকে হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে বাঁচতে হয়েছে।

অথচ আজকের মতো তার হাতে কামান বন্দুক-স্টেনগান ব্রেনগান বা মেশিনগান ছিল না।

ছিল না একটা সাধারণ ছুরিও।

তখন তার একমাত্র সম্বল পাথর ঘসে ঘসে আগাটা কিছু সূঁচালো করে তৈরি এক ধরনের পাথরের অস্ত্র।

এ অস্ত্র দিয়ে একা একজনের পক্ষে বড় আকারের কোন হিংস্র জীবজন্তুর বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব নয়।

সম্ভব নয় খাবার জুটানো।

অথচ তাকে বাঁচতে হবে।

তাই দলবদ্ধ হয়ে থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলো মানুষ। অবশ্য গাছে থাকতেই মানুষ একত্রে বসবাস করতে অভ্যস্ত ছিলো।

সম্ভবতঃ এজন্যই সে তখনকার হিংস্র জন্তু জানোয়ারের কবল থেকে নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্বল হয়েও নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলো।

কথা বলতে শেখার পর একত্রে বসবাস করার কথা তারা আরো বেশি করে চিন্তা করলো।

গড়ে উঠলো মানুষের সমাজ।

শ্রম ও কথা বলার শক্তি একদিকে।

অপরদিকে হলো মস্তিষ্ক ও তার আনুষঙ্গিক বিভিন্ন ইন্দ্রিয়। একের ওপর অন্যের প্রভাবে উন্নতি ও বিকাশের ধারা এগিয়েই চললো।

তাই আমাদের 'গেছো পূর্ব পুরুষরা' দলবদ্ধ হয়ে বাস করে নিজেদের মধ্যে যে সমাজ গড়ে তুলেছিলো, তারাই আবার মানুষ হওয়ার পর, যে সমাজ গড়ে তুললো তার মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য।

মনুষ্য সদৃশ বানরের পাল নিজেদের গণ্ডির বাইরে যেতো না। কোন একটা অঞ্চলে ফল-মূল, ডাল-পাতা সব চিবিয়ে খেয়ে কোনমতে বেঁচে থাকতে পারলেই হলো।

আবার শীত প্রধান দেশে এক রকমের খাবার মেলে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আর এক রকম।

উত্তরে এক।

দক্ষিণে আর এক রকম।

এই ভৌগলিক অবস্থান আর আবহাওয়ার অবস্থা অনুযায়ী যা মেলে তাই খেয়ে কোন রকমে জীবন বাঁচাতে হয়।

এই ছিলো তখনকার 'গেছো পূর্ব পুরুষদের' অবস্থা।

যদি প্রকৃতির নিয়মে, আবহাওয়ার পরিবর্তনে কোন অঞ্চলের খাবার শেষ হয়ে যেতো, তখন কিন্তু তাদের নিজেদের গণ্ডি ছেড়ে বাইরে বের হতে হতো। যেখানে যেতো, সেখানে যদি তাদের মতো অপর একটা দল থাকতো, তাহলে দু'দলে যুদ্ধ করে একদলকে জয়ী হতে হতো। বিজয়ীদল সেস্থানে

তাদের সাময়িক আবাস গড়ে তুলতো।

অবশ্য প্রকৃতির উপরই তাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হতো। প্রকৃতি তার মর্জি মাফিক যা দিয়ে রেখেছে, বা যা হতো, তার বেশি কিছু ফলিয়ে বা গজিয়ে তোলার ক্ষমতা তাদের ছিলো না। যদিও এদের মল মূত্র সার হয়ে জমির উর্বরতা কিছুটা বাড়তো। তবে তা উপলব্ধি করার মত জ্ঞান সে সময়ে তাদের ছিলো না।

মোট কথা, মনুষ্য সদৃশ বানরদের নির্ভর করতে হতো প্রকৃতির ওপর।

একদিন খাবার জুটাবার মত বন-জঙ্গলও শেষ হয়ে গেলো।

খাবার না থাকলে বাঁচার সম্ভাবনা থাকে না।

ফলে, তাদের বংশবৃদ্ধিও রুদ্ধ হয়ে গেলো।

কারণ তাদের তখন বিচার বিবেচনা করার শক্তি ছিলো না। তাই, তারা খাবার নষ্ট করতো প্রচুর। একটা গাছ হয়তো অংকুরেই চারা থাকতেই খেয়ে শেষ করে ফেললো। গাছটা বড় হলে কত ফুল-ফল, ডাল-পালা হতো, একথা চিন্তা করার মত শক্তি তাদের ছিলো না। যা আছে খেয়ে শেষ করে নাও। আগামীকালের কথা ভাবার দরকার নেই। ফলে এক সময় যখন খাবার শেষ হয়ে যায়, তখন অনাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া ছাড়া আর উপায় থাকে না।

তবু প্রাণকে কে না বাঁচাতে চায়?

ওই প্রাণ বাঁচাবার তাগিদেই তাদের ছুটতে হয়েছে এদিক সেদিক। এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে।

এমনি করে প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে গিয়ে বহু রকমের জীবজন্তু একেবারে বংশ সুদ্ধ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

মনুষ্য সদৃশ বানরদের মধ্যে 'সেই বিশেষ জাতীয় বানরদের' বুদ্ধি ছিলো বেশি। জীবন যুদ্ধে বেঁচে গেলো তারাই। নতুন জায়গায়। নতুন অবস্থার সঙ্গে কিছুটা খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে শিখলো।

এরা আরো নতুন নতুন গাছপালা খুঁজে বের করলো।

একেবারে ঝাড়ে মূলে না খেয়ে একটু বাছ বিচার করতে লাগলো।

বেড়ে গেল খাবারের রকম।

পশু আর মানুষের সমাজে যে শ্রম তা কিন্তু এ শ্রম নয়।

মানুষের সমাজে নানারকম হাতিয়ার তৈরি করা থেকেই আসল শ্রমের শুরু।

জীবজন্তুরাও দাঁত, নখ কিংবা অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ দিয়ে নানা কাজ করতে পারে। কিন্তু ঠিক সেইসব কাজ করার জন্যই সেই আদিম মানুষের নানা হাতিয়ারের প্রয়োজন হয়েছিলো। যেমন, মাটি খুঁড়ে শিকড় বের করার জন্য, থাকবার আস্তানা তৈরি করার জন্য, শিকার করার জন্য।

সেই আদিম মানুষ যেসব হাতিয়ার দিয়ে কাজ করতো তার অনেক রকম হাতিয়ার পাওয়া গেছে মাটির তলা থেকে।

আবার এখনও বহু অসভ্য জাতি রয়েছে, যাদের জীবন যাত্রা সেই আদিম মানবের মতই। তাদের জীবন যাত্রা প্রণালী থেকেও আদিম মানুষের হাতিয়ার সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

ওই সব হাতিয়ারের মধ্যে শিকার ও মাছ ধরার হাতিয়ারই সব চাইতে পুরাতন। আবার প্রয়োজনবশতঃ শিকারের হাতিয়ারই হতো লড়াইয়ের অস্ত্র।

নতুন খাদ্যের প্রভাব

মানুষ যখন মাছ ধরতে শিখেছে, শিকার করতে আরম্ভ করেছে, তখন তার খাবারের তালিকায় নিশ্চয়ই মাছ মাংসেরও যোগ হয়েছে। তার আগে খাবার ছিলো শাক-সবজি আর ফল-মূল।

আমরা যে খাবার খাই, তা দিয়েই আমাদের দেহ গড়ে ওঠে। পূরণ হয় দেহের ক্ষয় ক্ষতির।

এক এক রকম খাবারের এক এক গুণ।

তাই সম্পূর্ণ নিরামিষাশী মানুষ যখন প্রথম মাছ মাংস খেতে আরম্ভ করলো তখন সে খাদ্যের প্রভাবেও তার দেহের অনেক পরিবর্তন ঘটলো।

আমরা জানি, শরীরের বিভিন্ন অংশ পুষ্টি টেনে নেয় রক্ত থেকে। খাবারে মাছ মাংস থাকলে এই প্রক্রিয়াটি আরো ভালো ভাবে চলে। ফলে হজম শক্তি বেড়ে যায় ও স্বল্প সময়ে হজম হয়ে যায়।

আবার শুধু পুষ্টি হলেই চলে না। দেহেরও বৃদ্ধি চাই।

মানুষের দেহের বৃদ্ধির ব্যাপারে কোন কোন প্রক্রিয়া চলে অনেকটা গাছ-পালার প্রক্রিয়ায়। খাবারে মাছ-মাংসের গুণে দেহের বৃদ্ধির সেই সব প্রক্রিয়া আরো ভালো ভাবে চলে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, খাবারের তালিকায় মাছ মাংসের যোগের ফলে মানুষের দুটো উপকার হচ্ছে। কম সময়ে হজম ও দেহ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া আরো দ্রুত চলা। দেহের যেটুকু বৃদ্ধির জন্য হয়তো এক বছরের সময় প্রয়োজন, তা আরও কম সময়ে হয়ে যাচ্ছে। ফলে, দেহ গঠনের মাল মশলা বেশি পাওয়া যাচ্ছে। কমে যাচ্ছে শক্তির অপচয়।

এই যে বাড়তি মাল মশলা আর শক্তি, এ দিয়ে মানুষের আসল প্রাণীসুলভ প্রকৃতি-গঠনে অনেক সুবিধা হয়েছে।

এরই ফলে মানুষ উদ্ভিদ জগৎ থেকে আরও স্বতন্ত্র, আরও উন্নত হয়ে উঠেছে।

বেড়েছে মানুষের দৈহিক শক্তি।

এসেছে স্বাধীনতা।

এসেছে প্রকৃতির হাত থেকে মুক্তি।

এই 'মুক্তি' মানুষ হওয়ার পেছনে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মানুষকে যখন শুধুমাত্র প্রকৃতি প্রদত্ত ফলমূল বা শাক সবজির ওপর নির্ভর করতে হতো, আর কোন খাবারের কথা সে জানতো না, তখন তাকে অনেক সময় অনাহারেও মরতে হতো।

কোন কারণে ফলমূল বা শাকসব্জি না পাওয়া গেলে তাকে উপোস করতে হতো। মানুষ ছিলো সে সময়ে প্রকৃতির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তখনো সে নিজের চেষ্টায় চাষ করে ফসল ফলাতে পারতো না। এ সম্বন্ধে কোন ধারণাই তার ছিলো না। প্রকৃতির তরফ থেকে যা পাওয়া যেতো তাই তাকে খেয়ে জীবন বাঁচাতে হতো। না পাওয়া গেলে অন্য কোন দিকে খাবারের সন্ধানে ছুটতে হতো। সেখানেও ভাগ্য চক্রে না মিললে তাকে না খেয়ে মরতে হতো। আর পাওয়া গেলেও, অন্য কোন দলের মানুষ সেখানে থেকে থাকলে, নতুন আগন্তুকদের যুদ্ধ করে পূর্ববাসীদের হটিয়ে দিতে হতো বা নিজেদের মৃত্যু বরণ করতে হতো।

মানুষ যখন মাছ মাংস খেতে শিখলো তখন তার খাবারের অনেকটা স্থিতি এসে গেলো। প্রকৃতির ওপর

আর বিশেষ নির্ভর করতে হলো না। ফল-মূল, শাক-সব্জি না থাকলে কি হলো ? পানিতে রয়েছে প্রচুর মাছ। আশে-পাশেই রয়েছে অন্যান্য পশু—যাদের মাংস খাওয়া যায়।

সেই সময়ে—সেই আদিম যুগে খাদ্যের অনিশ্চয়তা থেকে —প্রকৃতির হাত থেকে এই যে মুক্তি, তা সত্যিই মানব জীবনে একটা বড় ধরনের বিপ্লব।

জীবন রক্ষায় খানিকটা নিশ্চয়তা বিধান।

আবার মানুষের এই নতুন ধরনের খাবার খাওয়ার ফলে দেহেও এলো পরিবর্তন।

মস্তিষ্কের ওপরও পড়লো বিরাট প্রভাব।

মাছ মাংসে এমন সব মাল মশলা আছে যা মস্তিষ্কের পুষ্টি আর বৃদ্ধির জন্য না হলেই নয়। খাবারে মাছ-মাংস যোগ হওয়ার পর থেকে মস্তিষ্কের পুষ্টি আর বৃদ্ধি আরও ভালো ভাবে চলতে লাগলো।

অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, যারা নিরামিষাশী তাদের কি বুদ্ধি নেই ?

আছে। নিশ্চয় আছে।

নিরামিশ আর মাছ-মাংসের উপাদান একই।

তবু মাছ মাংসের খাবার খেয়েই মানুষ মানুষ হয়ে উঠেছে।

মানুষ যদি সেই শাক-সবজির খাবারেই বাঁধা পড়ে থাকতো তাহলে কি হতো।

উন্নত ধরনের বানর থেকে সেই যে ক্রমে ক্রমে মানুষ হয়ে গড়ে উঠলো, তা আর হতো না।

আমরা জানি, জীবন ধারণের জন্যই বাধ্য হয়ে আমাদের গেছো-পূর্ব-পুরুষরা মাটিতে নেমে এসেছিলো নতুন খাবারের সন্ধানে।

ক্ষীর সাগর বা দুধের পুকুর থেকে তারা নিশ্চয়ই জন্তু জানোয়ারের পেছনে ছুটোছুটি করে মরতো না।

এই মাছ মাংস/ ভোজনের অভ্যাস থেকেই আদিম মানবের ভেতর বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন সময়ে 'মানুষখেকো মানুষের' সৃষ্টি হয়েছিলো।

এখন অবশ্য মানুষ আর মানুষ খায় না॥

তবে অন্য ভাবে মানুষকে শেষ করার সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। সে-সব অন্য প্রসঙ্গের কথা

একদল মানুষ (বাংলাদেশে শতকরা ৮০ জনই এ দলের) অল্প কিছু ধনী আর বড় বড় পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের হাতের পুতুল মাত্র। জাতীয় আয়ের সিংহ ভাগটাই তাদের সিন্দুকে গিয়ে ওঠে।

যেখানে খাবারের প্রশ্ন? খাবারের জন্যই আমাদের পূর্ব-পুরুষরা তখনকার দিনের বড় বড় হিংস্র জীবজন্তুতে ভর্তি মাটির ওপর নেমে এসেছিলো। সামান্য একটু অসাবধান হলেই মূহূর্তে অন্যান্য হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণের মুখে পড়ে প্রাণ হারাবার ষোল আনাই সম্ভাবনা ছিলো।

তবু নেমে এসেছিলো।

প্রাণের মমতাও তাকে গাছে ধরে রাখতে পারেনি।

কারণ বেঁচে থাকতে হলে খাদ্যের প্রয়োজন।

না খেয়ে মরার চেয়ে বাঁচতে গিয়ে মরা ভালো।

অনেক ভালো।

তাইতো বাংলার মানুষ যখন দেখলো, তাদের খাবার জুটছে না, সব সম্পদ লুট হয়ে যাচ্ছে—জমা হয়ে পড়ছে পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের সিন্দুকে, তখন আর চুপ করে থাকতে পারেনি।

খালি হাতে এগিয়ে এসেছিলো সশস্ত্র সৈন্যদের বিরুদ্ধে।

মরলো এদেশের মানুষ পশুর মতো।

তবু জনতা জয়ী হলো।

হেরে গেলো পশু শক্তি।

বাংলার মাটি আজ মুক্ত।

কিন্তু সত্যই কি মুক্ত?

না। এখনো আমরা পুরোপুরি মুক্ত নই।

মানুষের মুক্তি এখনো আসেনি।

শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এ মুক্তি আসতে পারে না।

যে খাবারের জন্য সংগ্রাম, তাই যতদিন পর্যন্ত এদেশের মানুষের হাতের মুঠোয় না আসবে—প্রতিটি লোক যতদিন দু'বেলা ভরপেট খেতে না পাবে ততদিন পর্যন্ত সত্যিকার

মুক্তি এসেছে একথা বলা যায় না।

আগুন ও পশু পালন ঃ নতুন মুক্তি

মাংস খাওয়া থেকেই আদিম মানুষ দুটো বিরাট শক্তি অর্জন করেছিল।

আগুন ব্যবহার ও পশু পালন।

এ দুটো আবিষ্কারই মানব সভ্যতার মূল সোপান।

আগুন আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে মানুষ কাঁচা মাংস খেতো। কাঁচা মাংস হজম করা শক্ত। কিন্তু আগুনে পুড়িয়ে নিলে মাংসের টুকরাটা মুখে দেয়ার আগেই হজমের কাজটা অর্ধেক এগিয়ে থাকে।

তাই, আগুন মানুষের হজম প্রক্রিয়াটা অনেক সহজ করে দিলো।

আর পশু পালন পদ্ধতি শেখার পর মানুষের খাবার সংগ্রহের কাজে একটা নিশ্চিন্ত স্বনির্ভরতা এলো। শিকার

সব সময় নাও মিলতে পারে। যেদিন মিলতো না, সেদিন মানুষকে উপোসই করতে হতো।

কিন্তু পশু পালনের পর থেকে উপোস থাকার হাত থেকে মানুষ বেঁচে গেলো।

শিকার না মিললে কি হলো?

ঘরেই মওজুদ রয়েছে পালিত পশু। প্রয়োজনমত দু'একটা মেরে খাবারের কাজে লাগলেই হলো।

কাজেই দেখা গেলো, আগুন আর পশু পালন সেদিনের আনাড়ী মানুষের জীবনে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

খাবারের নিয়মিত ব্যবস্থা হলো, আর হজম প্রক্রিয়াটাও সহজ হয়ে এলো।

তাছাড়া পালিত পশুদের মধ্যে গরু, ছাগল বা মহিষের দুধ সংগ্রহ করে খাবার ব্যবস্থা করার পর আর একটা নতুন বিশেষ খাদ্য বেড়ে গেলো।

দুধে রয়েছে মাংসের উপাদান। মানব শরীর গঠনে এই উপাদানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ছোটদের জন্য। মায়ের দুধ কোন কারণে কমে গেলে এই সমস্ত পশুর দুধ দিয়েও মানব শিশুকে বাঁচানো যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, মানুষ পশু-জীবন থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। আলাদা করে নিজেদের জীবন ও জীবিকা গড়ে তুলছে। আর ক্রমেই মানুষ আরো মানুষ

হয়ে উঠছে।

আমাদের আজকের আধুনিক শিল্প বিজ্ঞানের যুগের উন্নতির মূলেও রয়েছে ওই আগুন।

প্রথমে আগুনে পুড়িয়ে, পরে সিদ্ধ ও রান্না করে নানা রকমের খাবার খেতে শিখলো মানুষ।

এখন আর কেউ কাঁচা মাংস পুড়িয়ে খায় না।

নানা রকম মশলা সহযোগে রান্না করে সুস্বাদু করে খেয়ে থাকে।

তারই বা কত নাম।

কত রকম ভেদ।

স্বাদেরই বা কত তারতম্য।

অবশ্য পরিবেশ আর আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে এক একদেশের মানুষ এক এক রকম খাবার খেতে অভ্যস্ত।

যেমন বাংলা দেশের মানুষ ভাত মাছ খেয়ে থাকে।

পাঞ্জাব বা অন্যান্য প্রদেশে রুটি মাংস অধিক খেয়ে থাকে।

চীন দেশে আরশোলা, ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদিও বাদ যায় না।

আবার কোন কোন দেশে শুধু ফলমূলই মানুষের অধিক প্রিয় খাদ্য।

যাহোক, খাদ্যের ব্যাপারে মানুষের নির্ভরতা আসার পরই তার স্থিতিশীলতাও এসে গেলো অনেকটা।

এখন আর তাকে শুধুমাত্র খাদ্যের প্রয়োজনে এক স্থান

থেকে আর এক স্থানে ঘন ঘন দৌড়াতে হয় না। কারণ সে তখন বাইরে থেকে খাবার সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করতে শিখলো। ক্ষেতে ফসল ফলালো। তা আবার পাক করে খেতে আরম্ভ করলো। পুষ্করিণী কাটিয়ে সমুদ্র বা নদীর মাছ বাসস্থানের কাছাকাছি জায়গায় এনে সংরক্ষণ করলো।

তারও আগে মানুষকে শিখতে হলো জলবায়ুর যে কোন অবস্থায় বাস করা।

মানুষের শৈশবকাল আরম্ভ হয়েছিলো গীষ্ম মণ্ডলের কোন এক স্থানে। সেই আদি বাসস্থানে ছিলো একটানা গরম।

এই একটানা গরম থেকে মানুষ বেরিয়ে পড়েছিলো একটু ঠাণ্ডা আবহাওয়ার খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে এমন জায়গা পাওয়া গেলো, যেখানে একটানা গরম নয়। ঋতু পরিবর্তন হয়। বছরটা অন্ততঃ শীত আর গ্রীষ্মে ভাগ করা।

তার ওপর ফসল ফলাতে হলে পানির প্রয়োজন। তাই বোধ হয় মানুষের বসতি প্রথম প্রথম নদীর ধারে ধারে গড়ে উঠেছিলো।

আর বসতি গড়ে উঠেছিলো বৃষ্টি প্রধান দেশে।

ক্রমে মানুষের বংশ বৃদ্ধি হতে লাগলো।

বুদ্ধি বাড়লো।

ঠেকে কাজ করতে শিখলো।

নতুন নতুন পথ।

বাঁচার নতুন কৌশল আয়ত্তে এসে গেলো।

জীবন ও জীবিকার একটা নিশ্চিত ব্যবস্থা গড়ে উঠলো।

নতুনকে জানার জন্য বা প্রয়োজনের তাগিদে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো মানুষ।

গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত—তা সে যেখানে যত নিষ্ঠুরই হোক্ না কেন, তারই মাঝে মানুষ বসবাস করার ব্যবস্থা করে নিলো। প্রথম প্রথম অসুবিধা হলেও ক্রমে সব রকম আবহাওয়ায় মানুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠলো।

নিতান্ত দুর্বল দু'পেয়ে জীব—প্রকৃতির হিসাবে যে কিছু-দিন আগে মাত্র চার পা থেকে দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে শিখেছে, সেই এক সময় প্রকৃতির সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে নিলো।

৯

মানব সভ্যতার জয়ধ্বনি

ক্রমে দিন দিন মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকলো।

প্রথমে যে স্থানে কিছু সংখ্যক মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করে, পরে সেখানে আর জায়গা হয় না।

নতুন জায়গার প্রয়োজন হয়।

নতুন নতুন দেশে ছড়িয়ে পড়ে মানুষ।

প্রথম জন্মভূমির একটানা উত্তাপ থেকে শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষার আবহাওয়ায় এসে পড়লো মানুষ।

অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে অনভ্যস্ত পরিবেশ।

নতুন পরিবেশ ও প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের

খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

শীত আর আর্দ্রতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় চাই। কাপড় চোপড় চাই।

শ্রম ও কাজের ধরন ধারনও বদলে গেলো।

হাত, কথা বলার শক্তি আর মস্তিষ্ক। এদের কাজ একই সঙ্গে চলে থাকে। এই তিনের সহযোগিতা না হলে কাজ চলে না।

হাত তো দেহের প্রধান কর্মকর্তা।

এ না হলে চলে না।

একত্রে অনেক লোক কাজ করতে হলে কিছু না কিছু বলতেই হবে।

আর মস্তিষ্ক হলো দেহপরিবারের সভাপতি।

যাবতীয় আদেশ নির্দেশ আসে মস্তিষ্ক থেকে।

তবেই তো চোখে দেখে, কানে শুনে, বুঝে সুঝে হাতের কাজ চলে।

এই যে তিনের কাজ চললো মিলেমিশে, এতে মানুষের কাজ করার শক্তিও গেলো বেড়ে। ফলে মানুষের মধ্যে আরও জটিল ও বড় কাজ করার শক্তিও বৃদ্ধি পেয়ে গেলো।

প্রয়োজনের তাগিদে, প্রকৃতির আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্যে কাজের বা শ্রমের প্রকৃতিও বদলাতে লাগলো।

একজন যা করেছে, পরবর্তী পুরুষকে তার চাইতে আরো উন্নত ধরনের কাজ করতে হচ্ছিলো।

ক্রমেই মানুষ এগোচ্ছিলো পশু থেকে মানুষ হওয়ার দিকে।

উন্নতির দিকে।

শিকার আর পশু পালনের সঙ্গে ক্রমে যোগ হয়েছে কৃষি, সুতো কাটা, তাঁত বোনা, ধাতুর কাজ, মৃৎশিল্প, অর্থাৎ কুমোরের কাজ। আরম্ভ হয়েছে জলপথে যাতায়াত।

আর জলপথ ব্যবহার আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক স্থানের সঙ্গে আর এক স্থানের, এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে উঠলো।

চাহিদানুযায়ী শিল্পোৎপাদনও বেড়ে গেলো।

এর সবই হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে।

নতুন নতুন অবস্থায় প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে তাকে আরো বেশি করে ভাবতে হয়েছে—বেশি করে পরিশ্রম করতে হয়েছে—বেশি করে মাথা খাটাতে হয়েছে।

এসব প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে সে আরো দক্ষ হয়ে উঠেছে। সঞ্চয় করেছে আরো নতুন নতুন অভিজ্ঞতা।

ক্রমে মানুষ হয়ে উঠলো আরো উন্নত ধরনের জীব।

'মনুষ্য সদৃশ বানর আর সে নয়।

পূর্ব পুরুষদের সঙ্গে গড়ে উঠেছে আরো অধিক পার্থক্য।

দিন দিন হয়ে উঠছে মানুষ।

উন্নতির পথে শেষ পর্যন্ত এলো মানুষের শিল্পকলা ও বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের চর্চা মানুষকে করে তুললো আরো মানুষ। প্রকৃতির ইতিহাসের সবচাইতে উন্নত ধরনের জীব।

জীবন ধারণের উপকরণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও পরিবর্তন হয়েছে।

রীতি-নীতি-বিচার-বিবেচনা সবই বদলে গেছে।

জাতি, রাষ্ট্র ও ধর্ম

আদিম গোষ্ঠিগুলো থেকে ক্রমে জাতি ও রাষ্ট্র গড়ে উঠলো।

এলো আইন কানুন। রাজনীতি।

এলো ধর্ম।

মানুষের সমাজ যখন অনেক পেছনে ছিলো তখনই ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে।

সমাজ ব্যবস্থা আর তার আংগিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিফলন হয় মানুষের মনের আয়নায়। তারই ওপর নির্ভর

করে গড়ে ওঠে ধর্ম।

বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন পরিবেশের বিভিন্ন ধর্ম।

সূর্যের উত্তাপ মানুষের প্রয়োজন।

বৃষ্টি না হলে ফসল হবে না।

আর ফসল না হলে খাওয়া বন্ধ।

আগুন হলো জীবন ধারণের অন্যতম সাহায্যকারী বন্ধু। আগুনে পুড়িয়ে মাংস খাওয়া হয়। পরে রান্না করতে হয়েছে ওই আগুনের সাহায্যেই। বনের হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে রাতে বসবাসস্থানের চারপাশে আদিম কালে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়েছে। আবার আগুনে সৃষ্টি হয় দাবানল। পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয় ঘর বাড়ি, মাইলের পর মাইল জঙ্গল।

চন্দ্র বিতরণ করে স্নিগ্ধ আলো।

দূর হয় রাতের অন্ধকার।

মানুষ তখন আজকের মত বুদ্ধিমান ছিলো না। এসবের গুণ বা ধ্বংসকারী শক্তিকে মনে করতো অলৌকিক।

তাই এসবই হলো দেবতা।

ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী।

দেবতা হলো বায়ু। দেবী হলো কলেরা, বসন্ত, ওলাউঠা ইত্যাদি মহামারী রোগ। আরো কত জানা অজানা দেব দেবী। অর্থাৎ মানুষ তখন নিজের চাইতে শক্তিশালী সবকে পূজো করতো। যা তার বোধগম্যের বাইরে, তার সবই

হলো ঐশ্বরিক।

মানুষের এসব সরল বুদ্ধিকে কাজে লাগানো হলো ধর্মের নামে।

মাটির পৃথিবীতে নেমে এলো ধর্মের অবতার।

প্রচার করা হলো স্বর্গ নরকের সুখ ও শাস্তির কথা।

পাপ পুণ্যের কথা।

আর এসবের নামকরা হলেন মহামানব।

মানুষকে একত্রে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হলে যেমন সমাজের প্রয়োজন, তেমনি সমাজের জন্য ধর্মেরও প্রয়োজন। পাপ-পুণ্যের হিসেব না থাকলে পশু থেকে বের হয়ে আসা মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জন্মাতো না।

মানুষ হয়ে উঠতো উচ্ছৃংখল ও অত্যাচারী।

তাই যুগে যুগে মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে। মানুষকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন ন্যায়-নীতি বোধ।

প্রয়োজনের তাগিদেই দরকার হয়েছিলো ধর্মের।

নতুবা চলছিলো না।

ধীরে ধীরে মানুষের জ্ঞান বাড়তে লাগলো।

নতুন নতুন বুদ্ধি এলো।

এলো নতুন করে বিবেচনার শক্তি।

পুরাতনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলো মানুষের।

শিক্ষা-দীক্ষা আর বিজ্ঞানের অনুশীলনে মানুষ ক্রমেই

উন্নতির দিকে এগিয়ে চললো।

এর প্রতিফলন ধর্মের ওপরও পড়লো।

হলো নতুন ধর্মের সৃষ্টি।

পুরানোর চাইতে আরো উন্নত ধরনের ধর্ম।

আরো বিজ্ঞান সম্মত।

এ যুগের সবচাইতে বড় সমস্যা হলো পেট।

খেয়ে পরে বাঁচতে হবে।

একা নয়।

সবাই মিলে।

পৃথিবীর সব নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষকে নিয়েই বাঁচতে হবে।

বাঁচতে হবে মানুষের মত।

মানুষ বহু লক্ষ বছরের সাধনায় মানুষ হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখনো তার স্বভাবজাত পিতৃ পুরুষের গুণটুকু ছাড়তে পারেনি। ধোপ দুরস্ত পোশাকের আড়ালে তা লুকিয়ে রয়েছে মাত্র।

পশুর মতো 'নিজে বাঁচো' এই নীতি এখনো সে ছাড়তে পারেনি।

মানুষের কাঁধ থেকে এই 'ভূত' ছাড়াতে হবে।

ধীরে ধীরে তা ছেড়েও যাচ্ছে।

এর পরই আসবে মানুষের সত্যিকার সুখ।

সার্থক হয়ে উঠবে তার মানুষ হওয়ার সাধনা।

অবশ্য সুবিধা ও স্বার্থবাদী মানুষ সহজে তার 'আসন' ছাড়তে চাইবে না।

তবু কেউ তা টিকিয়েও রাখতে পারবে না।

জীব জগতের স্বভাব ধর্ম উন্নতিকে বাধা দিয়ে রাখা যায় না। প্রয়োজনের তাগিদে সে এগিয়ে যাবেই।

আমরা আসল আলোচনা থেকে অনেকটা সরে এসেছি। এবার আবার পূর্ব আলোচনায় ফিরে আসা যাক্।

মানুষের শ্রম আর মস্তিষ্ক বিকাশের পথেই সবকিছু সম্ভব হয়েছে।

পশু থেকে ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে মানুষ।

শ্রমের সংগঠন ও প্রকৃতি বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের গড়নও বদলেছে। মানুষও বদলে গেছে।

বদলেছে মানুষের চিন্তা শক্তি।

বদলেছে চিন্তার ধারা ও চিন্তার প্রকৃতি।

কিন্তু এই যে সব নতুন সৃষ্টি—শিল্প, কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন-কানুন, রাজনীতি, জাতি, রাষ্ট্র ও ধর্ম এইসব ক্রমে মানুষের মনটাকে একেবারে জুড়ে বসলো।

শ্রমের দ্বারা, শ্রমের প্রক্রিয়ার ভেতর থেকেই তো সৃষ্টি হলো এসব। আর একবার সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই প্রত্যেকটির ওপর অন্যটির প্রভাব পড়তে লাগলো। ক্রমেই খুব জটিল পথে চললো এদের বিকাশ।

শ্রম ও উৎপাদন পদ্ধতির প্রভাব আগে পড়তো সোজা-

সৃজি।

এখনও পড়ে।

তবে ওই জটিল পথ ঘুরে আসার ফলে সে-প্রভাবটি আর স্পষ্ট দেখা যায় না। ফলে মনে হয়, এসব বুঝি নিছক মনেরই ফসল।

মনের স্বাধীন সৃষ্টি।

এ মনোভাব যখন দেখা দিলো, তখন শিল্প দর্শন-সাহিত্য-কলা-ধর্ম-রাজনীতির কৌলিন্যের ফলে বেচারা হাতের কাজ-গুলো অপাংক্তেয়—অস্পৃশ্য হয়ে গেলো।

অথচ এক সময় হাতই ছিলো মানুষের ভাগ্য বিধাতা।

বুদ্ধিমান অলসের আবির্ভাব

ইতিমধ্যে কিছু বুদ্ধিমান কিন্তু অলস ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটলো। তাদের উদ্দেশ্য মহৎ। অপরের জন্য তারা খেটে খুটে মরতে লাগলো। আর তা শুধু বুদ্ধি দিয়ে—মাতব্বরী

করে।

নিজেরা কোন কাজ করতো না।

তারা শুধু কাজ কর্ম কি ভাবে চলবে না চলবে তা ঠিক করে দিতো।

কাজ করিয়ে নিতো অন্যকে দিয়ে।

সমাজে আজ আমরা যে পারিবারিক সংগঠন দেখতে পাই, তা গড়ে উঠতেও অনেক সময় কেটে গিয়েছিলো। এই পরিবার পুরোপুরি গড়ে ওঠার আগেই ঐ মানুষগুলো মজিয়ে উঠেছিলো। এরাই মাথা খাটিয়ে কাজের ধরন ধারন ও বিলি ব্যবস্থা সব ঠিক করে দিতো।

এভাবে কাজ চলার ফলে মানুষের মনে একটা ধারণার সৃষ্টি হলো যে, সভ্যতার মূলে রয়েছে মানুষের মন। মস্তিষ্কের বিকাশের ফলেই সবকিছু সম্ভব হয়েছে। কারণ ওই মস্তিষ্ক খাটাবার ফলে মানুষ নতুন নতুন দিকে অগ্রগতির পথ খুঁজে নিয়েছে। সে ভেবেছে। আর সেই ভাবনাকে কাজে লাগিয়েছে।

এবং কাজে লাগিয়ে সে সার্থক হয়ে গড়ে উঠেছে।

এ ধারণাটাও একেবারে মিথ্যা নয়।

মস্তিষ্কের বিকাশ না ঘটলে সমাজের প্রগতি হতো না। সভ্যতা গড়ে উঠতো না। কিন্তু মস্তিষ্ক, মনের সৃষ্টি ও গড়ন, মনের গতি ও প্রকৃতি এসবই যে শ্রম প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত, তা তারা আর দেখলো না।

তারা অস্বীকার করলো একথা, বললো, এ সবই নিছক মনের সৃষ্টি।

একটা কাজ আমি করেছি। তা সে যে কাজই হোক। যদি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি, কেন ওই কাজটা করলাম? তখন কি বলবো? বলবো, আমার চিন্তা আমাকে এই পথে ঠেলে দিয়েছে। মন বলেছে, তাই করেছি।

আসলে ব্যাপারটা অন্যরকম নয় কি?

মন বলেছে, তা আমরা ভাবি বটে। কিন্তু মন তো আর শুধোশুধি বলে না! কিছু করা বা না করার তাগিদটা আসে প্রয়োজন থেকে। যখনই কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তখনই আমরা তা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাই।

তার আগে নয়।

প্রয়োজনের কাছে ন্যায়, নীতি আর ধর্মের দোহাই খাটে না। তাই তো অভাবে পড়লে জেল আর ফাঁসীকে উপেক্ষা করেও মানুষ বে-আইনী কার্যকলাপে এগিয়ে যেতে ভয় পায় না।

এবং এই প্রয়োজনের তাগিদেই একদিন মানুষ পশু থেকে রূপান্তরিত হয়েছে মানুষে।

এই যে 'প্রয়োজন' এ তো মস্তিষ্কের বাইরের।

এর তাগিদটা ফুটে ওঠে মনে।

মনের চিন্তা ও চেতনাকে খুঁচিয়ে তোলে সেই 'প্রয়োজনের তাগিদ'।

অথচ এই মূল সত্যটাকে মানুষ আজ অস্বীকার করে।

মানুষের মস্তিষ্ক ও মনের বাইরে বাস্তব জীবনে নানা ক্রিয়া প্রক্রিয়া চলছে। বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে। নানা বাস্তব প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। এ সবকিছুই হয়ে দাঁড়ালো পরের কথা! গৌণ!

মানুষের মন আর চিন্তাই হয়ে উঠলো মুখ্য।

আসল সত্যটা গেল তলিয়ে।

আর মানুষ এই ভুল ধারণা নিয়েই সবকিছু বিচার করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। দৈনন্দিন জীবন, রাজনীতি, দর্শন, বহিঃপ্রকৃতির ঘটনাবলী এ সবকিছুকেই মানুষ ক্রমে এইভাবে দেখতে লাগলো।

প্রাচীন কালের অবস্থা-ব্যবস্থা শেষ হয়ে যাবার পর থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গী মানুষকে আরো আচ্ছন্ন করে ফেললো। এই 'ভাবব্যাদী' দৃষ্টিভঙ্গী আজও অনেক মানুষের মনকে শাসন করছে।

যে শ্রমের জন্য, যে শ্রমের ফলেই মানুষ হয়ে উঠেছে মানুষ ; তাই আজ মানুষ ভুলে যেতে বসেছে।

তাইতো আজকের পৃথিবীতে মেহনতী মানুষের দাম নেই। যারা 'ওপর তলায়' শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিস কামরায় বা শোবার ঘরে বসে সাধারণ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে তারা শ্রমের দাম কি করে দিতে পারে? তারা কি করে বুঝবে যে, শ্রমই মানুষকে মানুষ বানিয়েছে। যার পেছনে

রয়েছে মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও জীবন মরণ সংগ্রাম। তাকে অবহেলা করার অর্থই হলো শ্রমের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া —লক্ষ লক্ষ মানুষকে বঞ্চনার রাজ্যে ঠেলে দেয়া।

যারা এক সময় ছিলো সমাজে নিতান্ত অলস; একটু বেশি মস্তিষ্ক আর বুদ্ধি খাটিয়ে যারা এক সময় সাধারণ মানুষের ওপর খবরদারী করেছিলো, তারা আজো আছে; তাই করছে। করছে সাধারণ মানুষের ওপর মাতব্বরী।

অবশ্য এদের ধরন ধারন বদলে গিয়েছে।

আরো উন্নত ধরনে আর নতুন নতুন পথে, নতুন নতুন পোশাকের অন্তরালে আগের মতই মানুষকে ঠকিয়ে যাচ্ছে এবং আজো তারা সমাজের শীর্ষস্থানেই রয়েছে। এরাই মানুষের শ্রমকে অস্বীকার করে তারই ওপর ভাগ বসিয়ে নিজেরা ফেঁপে ফুলে উঠছে।

শ্রমকে যেদিন মানুষ উপযুক্ত দাম দিতে পারবে, সেদিনই এ পৃথিবীতে আসবে মানুষের সত্যিকার জয় জয়কার।

১০

প্রকৃতি জয়ে মানব সভ্যতা

মানুষ, মানুষ হয়ে ওঠার পরও হয়তো বেশিদিন টিকে থাকতে পারতো না। অন্যান্য জীবজন্তুর মতই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যেতো অথবা কোনরকমে না বাঁচার মতো বেঁচে থাকার চেষ্টা করতো। অন্ততঃ আজকের মতো পৃথিবীর সর্বত্র প্রকৃতির আসল বাসিন্দাদের বংশধরদের হটিয়ে দিয়ে নিজেদের নিরংকুশ আধিপত্য বিস্তারলাভে সমর্থ হতো না।

মানুষের এই যে জয় জয়কার, এর প্রধান কারণ হলো মানুষ তার কাজকর্ম দিয়ে বহিঃপ্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায় অর্থাৎ প্রয়োজন মত প্রকৃতিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে।

অবশ্য অন্যান্য প্রাণীও তা করে।

কিন্তু মানুষের মতো নয়।

এই যে পরিবর্তন ঘটে বহিঃপ্রকৃতির রাজ্যে—এর পাল্টা প্রভাব পড়ে মানুষের ওপর কিংবা অন্যান্য প্রাণীর ওপর। অর্থাৎ যে সেই পরিবর্তন ঘটায় তার ওপর।

এর কারণ কি?

এর মূলে রয়েছে সেই অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের নিয়ম বা পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়ম।

কোথাও কিছুই-তো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

সবকিছুই আর কিছুর ওপর কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করে। কখনও সোজাসুজি, কখনও বা জটিল ঘুর পথে।

এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে কোন কিছুই বাদ যায় না।

অন্যান্য প্রাণী বহির্জগতে যে পরিবর্তন ঘটায় তা কিন্তু ভেবেচিন্তে নয়। যদিও খাদ্যের প্রয়োজনেই তারা এই পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু নিজেদের এই সম্বন্ধে ভালো খারাপ কোন বোধ থাকে না।

খাওয়ার প্রয়োজন, খেয়ে যায়।

এতে তার ভালো মন্দের বাছ বিচার করে না।

হয়তো সবই খেয়ে শেষ করে ফেললো।

ভবিষ্যতে কি খাবে? একেবারে খেয়ে শেষ করার ফলে পুনরায় খাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে, এ সম্বন্ধে কোন ভাবনা চিন্তার বালাই নেই।

মানুষ তা করে না।

আজ, আগামী কাল ও ভবিষ্যতের কথাও ভাবে মানুষ। তাই সে কোন কিছু একেবারে খেয়ে শেষ করে ফেলে না। সে একই খাবার থেকে আরো নতুন খাবার উৎপাদনের চেষ্টা করে। যেমন, ধান গাছ লাগানো। তার থেকে ধান উৎপাদন হলো। সেই ধান থেকে বীজের ধান আলাদা করে রেখে দিয়ে তবে নিজের ব্যবহারে লাগালো।

ফলের গাছ লাগিয়ে ফলটুকুই সে খায়। গাছকে সে যত্ন করে বড় করে তোলে। অন্যান্য পশু যেমন ছাগল বা গরু, গাছ ও ফল দুটোই খেয়ে শেষ করে ফেলে। হয়তো অংকুরেই গাছ হজম হয়ে গেলো ছাগলের পেটে। গাছই নেই তো, ফল! এবং ফলে হয়তো তাদের খাওয়ারই একদিন অভাব পড়ে গেলো। এদের ছুটতে হলো নতুন খাবারের সন্ধানে। নতুন জায়গায়।

মানুষ তা করে না।

বিশেষ করে মানুষ দলবদ্ধ হয়ে একই জায়গায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করার পক্ষপাতী।

সন্তান সন্ততি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মমতা যে সংসারের প্রতি যে ভালোবাসা, সে-সবই মানুষকে এক স্থানে বসবাসের দিকে টেনে রাখে।

তার ওপর রয়েছে প্রকৃতির ওপর ভালোবাসা।

নতুন নতুন ফসল ফলাবার চেষ্টা।

গাছ লাগিয়ে সেই গাছের ফল নিজেদের খাদ্যের তালিকায় সংযোগ করার জন্যই মানুষের একই স্থানে পুরুষানুক্রমে বাস করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ভবিষ্যতের জন্য আরো ভাবতে শেখে মানুষ।

স্থিতিশীল হয়ে একই জায়গায় বসবাসের সাধনা আরম্ভ হয়।

দিনকে দিন মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে।

চিন্তাশক্তি বিকশিত হয়।

ক্রমে মানুষ হয়ে উঠতে থাকে মানুষ।

পৃথক হয়ে পড়ে বন্য জন্তু থেকে।

আজকের মানুষের অগ্রগতির পেছনে চিন্তা ভাবনার শক্তি, ভালোমন্দ বুঝার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

জীবজন্তুরা বন্য গাছপালা কিছু খেয়ে ফেলে ; কিছু বা কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই নষ্ট করে ফেলে।

মানুষ তা করে না।

মানুষ সব কিছুই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে করে থাকে।

গাছপালা, ঝোপঝাড় ইত্যাদি মানুষ করে বৃহত্তর লাভের আশায়। সেই ওই আগাছা পরগাছার জমি পরিষ্কার করে তাতে ফসল বোনে: প্রয়োজনীয় গাছপালা, শাক-সবজি, ধানপাট ইত্যাদি লাগায়।

কত বীজ ছড়ালে কত ধান পাওয়া যেতে পারে কিংবা একটা চারা লাগালে তার থেকে কত ফল পাওয়া যেতে

পারে, তাও মানুষ আগে থেকে হিসেব করে নিতে পারে।

আবার মানুষ, এক দেশ থেকে আর এক দেশে নিয়ে যায় গাছপালা ও জীবজন্তু। এমনি আমদানী রপ্তানী করে মানুষ গোটা দেশ কিংবা মহাদেশেরই গাছপালা, জীবজন্তুর রকম বদলে দেয় এবং দিয়েছে।

তাছাড়া চাষ আবাদ আর পশু পালনের ভেতর দিয়ে মানুষের হাতে পড়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে।

এক জাতের গাছপালা বা জীবজন্তুকে অন্য জাতের সঙ্গে মিশিয়ে নতুন রকমের গাছপালা ও জীবজন্তু পাওয়া যায়। যে জাত থেকে গোড়ায় শুরু, তার আর কোন চিহ্নই থাকে না।

আমাদের এখনকার ধান, গম গোড়ায় ছিলো না।

অন্য রকমের বুনো ঘাস থেকেই এর উৎপত্তি।

সেই মূল উদ্ভিদকে এখন খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রকৃতির এই জীবজন্তু ও উদ্ভিদের পরিবর্তন ঘটিয়েছে মানুষই। অন্য কারণেও কোন কোন ক্ষেত্রে এসব রূপান্তর ঘটেছে।

সব চাইতে বড় কথা হলো মানুষের এই যে ভেবে চিন্তে কাজ করার ক্ষমতা—প্রয়োজন মত নিজের জিনিসকে গড়ে নেবার সফলতা, এসব যে অন্যান্য প্রাণীদের একেবারেই নেই তা নয়।

তবে মানুষের মতো নয়।

প্রাণী জগতে মানুষ একক।

অদ্বিতীয়।

বিদ্যা, বুদ্ধি, চাতুর্য আর সফলতা মানুষকে প্রাণী জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছে।

মানুষ আজ জয় করে নিয়েছে নানা অসম্ভবকে।

চাঁদ আজ মানুষের হাতের মুঠোয়।

এক কালে যা ছিলো অসম্ভব, তাই আজ সম্ভব করে তুলেছে মানুষ।

চাঁদের মাটিতে পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে এসেছে মানুষ।

এবার মংগলগ্রহে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

হয়তো এক সময় মানুষ ছুটে বেড়াবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। চাঁদ হবে মানুষের 'হানিমুন কটেজ'।

তারপর ঘুরে আসবে মংগল গ্রহ থেকে।

হয়তো কোন দিন কোন মংগল-সুন্দরী বেড়াতে আসবে আমাদের এই গ্রহে—পৃথিবীতে। অবশ্য যদি মংগলগ্রহে আমাদের মত কোন মানব সন্তান থেকে থাকে।

তবে থাকাটা বিচিত্র নয়।

প্রকৃতির রাজ্যে সবই সম্ভব।

আমরা মানুষ কত টুকুইবা প্রকৃতিকে জানতে পেরেছি। নিজেদের গ্রহের অনেক খবরই আমাদের অজানা রয়ে গিয়েছে আজও।

লক্ষ লক্ষ বছরের ইতিহাসে আমরা সেদিনের মানব সন্তান কতটুকুইবা অনুমান করতে পেরেছি।

কতটুকুইবা এর প্রমাণ পেয়েছি!

খুবই সামান্য।

বিশাল প্রকৃতি আর ভূ-মণ্ডলে কোথায় কি ঘটছে বা কি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তা আমরা কি সঠিক বলতে পারি?

পারি না।

তবে চেষ্টা চলছে।

মানুষ বসে নেই।

অজানাকে জানতে হবে।

মানুষের এই যে জানার চেষ্টা—বোঝার চেষ্টা—প্রকৃতিকে জয় করে নিয়ে নিজের প্রয়োজনে লাগাবার চেষ্টা, এরই জন্যই তো মানুষ সামান্য এক 'গেছো বানর' থেকে মানুষ হতে পেরেছে।

মানুষের এই যে মানুষ হওয়ার সাধনা তা কি শেষ হয়েছে?

না। হয়নি।

মানুষ হতে চাইছে আজ অতি মানুষ।

তারপর?

তারপর কি হবে তা আমরা এখন কল্পনা করতে পারি না। করা সম্ভবও নয়।

আগের কথাও কি আমরা পুরোপুরি সঠিক বলতে পারি?

তাও নয়।

অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা, গবেষণা ও সাধনায় আমরা জানতে পেরেছি খুবই সামান্য। এর মধ্যে অনেকটাই অনুমান করে নিতে হয়েছে।

তবে এটা ঠিক, জীবন সৃষ্টি হয়েছে একদিন নিষ্প্রাণ জড় বস্তু থেকেই।

এ সম্বন্ধে পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি।

সামান্য কীট-পতংগ থেকে বয়ে এসেছে বিকাশের ধারা—কোটি কোটি বছরের বিকাশের ধারা। আমাদের কত শত পূর্ব পুরুষের দৈহিক বিকাশ ঘটেছে তারই ভেতর দিয়ে।

এবং তারই থেকে শেষ পর্যন্ত একদিন গড়ে উঠেছিলো আমাদের সেই 'গেছো পূর্ব-পুরুষ'—মনুষ্য সদৃশ বানর।

এই যে কোটি কোটি বছরের বিকাশের ধারা, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিকাশে।

একেবারে গোড়ার দিকে মাতৃগর্ভে মানুষের ভ্রূণের সঙ্গে মাছের ভ্রূণের অনেক মিল পাওয়া যায়।

দু'তিন সপ্তাহে এর পরিবর্তন ঘটে।

মাছের সঙ্গে মিল আর থাকে না।

আমাদের হৃদপিণ্ডে চারটি খোপ রয়েছে। কিন্তু ভ্রূণ অবস্থায় প্রথমে মাছের মতো মাত্র দুটি এবং পরে সরীসৃপের মত তিনটি খোপ হয়।

মাতৃগর্ভে ভ্রূণের পঞ্চম সপ্তাহে প্রত্যেকটি মানুষের ভ্রূণ মোটামুটি ১/৩ ইঞ্চি লম্বা থাকে এবং তার ১/৬ অংশ লম্বা লেজ থাকে।



মাতৃগর্ভে মানুষের ভ্রূণের বিকাশ

সাধারণতঃ অষ্টম সপ্তাহের মধ্যে এই লেজ লুপ্ত হয়ে যায়। তবে ওই লেজের সঙ্গে যেসব হাড়, পেশী ও স্নায়ু থাকে তার কিছু কিছু আমাদের সবারই রয়েছে। এগুলো একেবারে বিলুপ্ত হয়নি।

আমাদের সবারই এক সময়ে মোটা মোটা রেশমী মতো চুল ছিলো। একেবারে সারা গা ঢাকা ছিলো সেই চুলে।

সেও ছিলো মাতৃগর্ভে সপ্তম মাসে।

জন্মের ঠিক আগে কিংবা সামান্য পরেই তা মিলিয়ে যায়।

এমনি আরো নানা রূপ অদল বদল করে তবে হয় মানুষের শিশুটি।

এই যে মাছ, সরীসৃপ, লোমশজন্তু, লেজওয়ালা প্রাণী ইত্যাদি রূপ আমরা মাতৃগর্ভে ধারণ করে এসেছি, তাতে স্পষ্টতই বোঝা যায়। এসব প্রাণীরই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে—সবার পূর্ব-পুরুষই এক।

এ হলো দৈহিক বিকাশের কথা।

মানসিক বিকাশের বেলাতেও অনেকটা ঐ রকমই ঘটে থাকে।

কোটি কোটি বছরের প্রত্যেকটি স্তর হয় তো নয়। তবে শেষের দিককার পূর্ব পুরুষের মানসিক বিকাশের স্তরগুলো শিশুকে পার হয়ে আসতে হয়। এর বেলায় ঐ দীর্ঘ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে সংক্ষিপ্ত সময়ে।

আজকের সভ্য মানুষ নিশ্চয় তার পূর্ব পুরুষকে স্বীকার করে নিতে লজ্জা পাবে।

লজ্জা পাওয়ারই কথা।

সামান্য কীট পতংগ শেষ পর্যন্ত এক জাতের গেছো বানরকে কে পূর্ব পুরুষ বলে স্বীকার করতে পারে?

কিন্তু সত্যিই তাই ঘটেছে।

শুধু কীট পতংগ নয়।

এ পৃথিবীতে আমরা যা দেখছি, যত প্রকারের জীবজন্তু ও উদ্ভিদ দেখতে পাচ্ছি, সবার পূর্ব-পুরুষই এক।

ভাবতে আমাদের অবাক লাগারই কথা।

তবু তাই হয়েছে।

স্বাভাবিক ভাবে—জীবন রক্ষার তাগিদেই এতসব কিছুর পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে বর্তমান আকারে এসেছে।

প্রকৃতির এই পরিবর্তন, জীবজন্তুর মধ্যে এই পরিবর্তন আজো শেষ হয়নি। জীবন রক্ষার তাগিদে—প্রকৃতির আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন চলতেই থাকবে —হারাবে তার স্বাভাবিক রূপ। জন্ম নেবে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে বেঁচে থাকার মতো নতুন নতুন জীবজন্তু।

আজ আমরা মানুষের যে চেহারা বা আকৃতি দেখতে পাচ্ছি, প্রয়োজনের তাগিদে শেষ পর্যন্ত হয়তো এরকম নাও থাকতে পারে। আরও উন্নত ধরনের জীবে পরিণত হতে গিয়ে আমাদের বর্তমান আকৃতিটাই বদলে যেতে পারে। কি রকমটা হতে পারে, তা আমরা আগে থেকে কল্পনাও করতে পারি না। প্রয়োজনের জন্য যেরকমটা দরকার তাই হবে।

পৃথিবী, সূর্য ও মানুষের ভবিষ্যৎ

আমরা জানি, সূর্য হাজার হাজার মাইল ব্যাপী একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোন এক সময়, একটা বড় তারকা বা ধূমকেতুর আকর্ষণে সূর্য থেকে সামান্য একটা অংশ ছুটে বেরিয়ে এসে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। এই ছুটে আসা অংশগুলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত সূর্যের আকর্ষণ শক্তির বাইরে যেতে পারেনি। সূর্যের এই অংশটা এমন এক জায়গায় এসে আটকে গেলো, যখন আর এগুলো ছুটে যেতে পারলো না। সূর্যের আকর্ষণী শক্তিতে তার চারদিকে ঘুরতে লাগলো।

এ অংশগুলোর এক একটা এক এক গ্রহ।

সৌরজগতে ন'টা গ্রহ রয়েছে।

আমাদের পৃথিবীটাও এরই একটা গ্রহ।

এই পৃথিবী নামক গ্রহটা কমলা লেবুর মতো অনেকটা চ্যাপ্টা ও গোলাকৃতি।

পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের ওপর প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে। এবং এই ঘুরতে ঘুরতেই ৩৬৫ দিনে একবার সূর্যের চারপাশ দিয়ে চক্কর মেরে আসে।

এর আর ব্যতিক্রম নেই।

পৃথিবীর এই ঘোরাঘুরির জন্যই শীত-গরম বর্ষার আব-

হাওয়া সৃষ্টি হচ্ছে—দিন রাত্রি হচ্ছে।

আজকের পৃথিবীর যে শ্যামল স্নিগ্ধ আর মনোমুগ্ধকর রূপ দেখতে পাচ্ছি, তা কিন্তু প্রথম দিকে এরকম মোটেই ছিলো না।

সর্ব প্রথম তো একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড ছিলো।

একথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

তারপর ধীরে ধীরে তা ঠাণ্ডা হয়েছে।

এরপর একদিন বৃষ্টি ঝরে পড়লো পৃথিবীর মাটিতে।

জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড সংকুচিত হওয়ার ফলে পৃথিবীর জমি যে উঁচু নিচু হয়েছিলো তা পূরণ হয়ে গেলো বৃষ্টির পানিতে।

হলো সমুদ্র, মহাসমুদ্র আর নদ নদীর জন্ম।

এই বৃষ্টি হওয়ার পর অর্থাৎ পৃথিবীর মাটিতে পানির আবির্ভাবের পরই প্রাণের উৎপত্তি, জীব জগৎ আর উদ্ভিদের জন্ম সম্ভব হলো।

তারপর লক্ষ লক্ষ বছরের পরিবর্তনে আজকের পৃথিবীর রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এক কালে আমাদের এই পৃথিবীতে দু'ঘণ্টা পরে পরে দিন-রাত্রির আবর্তন চলতো। মাত্র চার ঘণ্টা সময়ের মধ্যে পুরো একটা পাক খাওয়া হয়ে যেতো পৃথিবীর।

তখন চন্দ্র ছিলো পৃথিবী থেকে মাত্র আট হাজার মাইল দূরে।

তারপর কয়েকশো কোটি বছরের মধ্যে পৃথিবীর দিন

রাত্রি একটু করে বিলম্বিত হয়েছে। একটু একটু করে আড়াই লক্ষ মাইল দূরে সরে গেছে চন্দ্র।

এখনো যাচ্ছে।

এবং আজ থেকে দু'হাজার বা তিন হাজার কোটি বছর পরে আরো প্রায় পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে সরে যাবে চন্দ্র।

তখন পৃথিবীর একটি দিনের মাপ হবে এখনকার সাতচল্লিশটি দিনের সমান।

আর সেই একই সময়ের মধ্যে চন্দ্র একবার মাত্র পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসবে। ফলে পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হবে, চন্দ্র আকাশের একই জায়গায় স্থির হয়ে রয়েছে। তার উদয়ও নেই, অস্তও নেই।

এবং পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের কাছে চন্দ্রের কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

তারপর আবার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকবে।

শেষ পর্যন্ত এমন এক বিপজ্জনক সীমানায় এসে পৌঁছবে, যখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রচণ্ড টানে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে আমাদের এই চির পরিচিত স্নিগ্ধ চন্দ্র।

এখন শনি গ্রহের চারপাশে যেমন একটি বলয় রয়েছে, তেমনি একটি বলয় পৃথিবীর চারপাশে পাক খেয়ে চলবে।

অবশ্য চন্দ্রের এই পরিবর্তিত দৃশ্য আমরা দেখতে পাব না। আমাদের সন্তান সন্ততিদের পক্ষেও দেখা সম্ভব নয়। সে সময়ে মানুষই বেঁচে থাকবে কিনা সন্দেহ।

প্রকৃতির হিসাবে দেখা যায়, এক একটা যুগে (আমাদের হিসেবের ১২ বছরে এক যুগ নয়। প্রকৃতির এক একটা যুগ আসে প্রায় ১২ কোটি বছর পরে।) এক এক রকমের জীবের আধিপত্য।

অবশ্য মানুষের একটা বিশেষ গুণ রয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা। পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে এই গুণটুকুরই বিশেষ প্রয়োজন।

শক্তি-সাহস আর বিরাটত্ব দিয়ে এর বিচার করা যায় না। এজন্যই দেখা গেছে, মধ্য জীবীয় যুগের অমন বড় বড় জীবজন্তুরাও টিকে থাকতে পারেনি।

নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

মানুষের সে-ভয় অনেকটা কম।

জ্ঞানে বিজ্ঞানে মানুষ যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠেছে। আজ অসীমের অভিযাত্রী মানুষ।

পৃথিবীর পরবর্তী পর্যায়ে যদি কোন দুর্যোগ আসেই, তাহলেও অতটা ভয় নেই। মানুষ নিশ্চয়ই তা কটিয়ে ওঠার পথ বের করে নেবে।

১১

পূর্বপুরুষের ঠিকানা

আমরা মানুষ।

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে আজ আমাদের গর্বের অন্ত নেই।

জ্ঞানে বিজ্ঞানে আজ আমরা উন্নতির উচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত। দু'লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরের পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ থেকেও ইতিমধ্যে মানুষ ভ্রমণ করে এসেছে। এবার মংগলগ্রহের পথে মানুষের অভিযান চলছে। একদিন হয়তো মংগলের মাটিতেও মানুষ তার পা রাখতে সক্ষম হবে।

তবু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কতটুকু জানতে পেরেছি?

মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে কতটুকুই বা সম্ভব!

নিজেদের খবরই তো আমরা আজ পর্যন্ত নিতে পারিনি। আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষকে চেনে নেবার মত প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণও জীব বিজ্ঞানের যাদুঘরে মওজুদ করে উঠতে পারিনি।

মানুষের পূর্ব পুরুষের নিদর্শন খুঁজে বের করার চেষ্টা শুরু হয়েছে মাত্র উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে। এর আগে কেউ ভেবে থাকলেও কাজে পরিণত হয়নি।

এই স্বল্প সময়ের প্রচেষ্টায়, সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রচুর না হোক, যা পাওয়া গিয়েছে তা অনিশ্চিত বা অনির্দিষ্ট নয়। মোটামুটি সফল হয়েছে মানুষ।

এসব নিদর্শন খুঁজে বের করতে মানুষকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয়েছে—প্রয়োজন হয়েছে বহু সাধনার।

পূর্ব পুরুষকে জানতে হবে, এই প্রেরণা মানুষকে করে তুলেছে দুঃসাহসী। পরিশ্রমী।

কাজটা যে কঠিন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আদিম মানুষ যে সব হাতিয়ার ব্যবহার করেছে এবং গুহার গায়ে যে সব ছবি এঁকে রেখেছে, সেগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়।

কিন্তু আদিম মানুষের মাথার এক টুকরো খুলি বা চোয়ালের এক টুকরো দাঁত বা শরীরের হাড় খুঁজে পাওয়াটা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

এই উদ্দেশ্যে বহু জীববিজ্ঞানী জীবনপাত করেছেন।

পুরো এক শতাব্দীর চেষ্টায় ভূ-পৃষ্ঠের নানা অংশ থেকে

মানুষের পূর্ব পুরুষের অল্প কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। কোথাও হয়তো মাথার খুলি, কোথাও হয়তো একটা দাঁত; এমনি সব টুকরো টুকরো।

কিন্তু আস্ত একটি নরকঙ্কাল কোথাও পাওয়া যায়নি। সম্ভবতঃ কোন কালেই পাওয়া যাবে না।

জীববিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন—টুকরো টুকরো বিভিন্ন স্থানে পাওয়া নিদর্শন থেকেই মানুষের পুরো চেহারাটা কল্পনা করে নিয়েছেন। মাথার একটুখানি খুলি বা চোয়ালের একটিমাত্র দাঁত দেখলেই তারা বলে দিতে পারেন, পুরো চেহারাটি কি ধরনের ছিল।

নিদর্শনগুলো বয়সের হিসেবে সাজিয়ে পর পর ছবি এঁকে গেলে দেখা যাবে, যতোই অতীতের দিকে যাওয়া যাচ্ছে, ততই বুনো হয়ে উঠছে মানুষের চেহারা। শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময়ে পৌছানো চলে যখন চেহারা দেখে কিছুতেই বলা চলে না, সেটি বানরের মত দেখতে একটি মানুষ, না মানুষের মত দেখতে একটি বানর।

জাভা মানুষ

মানুষের পূর্ব-পুরুষের এই না-মানুষ, না-বানর চেহারাটি আঁকা হয়েছে জাভা দ্বীপে পাওয়া নিদর্শন থেকে।

তাই একে বলা হয় 'জাভা মানুষ'।

ইউজেন দুবোয়া নামে একজন হল্যাণ্ডবাসী ডাক্তার এই জাভা মানুষের নিদর্শন আবিষ্কার করেন।

জাভা দ্বীপের পূর্বার্ধে সারি সারি কতকগুলো আগ্নেয়গিরি রয়েছে। 'সোলো' নামে একটি নদী প্রথমে দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে আগ্নেয়গিরিগুলোকে পাক খেয়ে পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে পড়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে।

১৮৯০ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৯২ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে এই অঞ্চলের মাটি খুঁড়ে তিনি প্রথমে খুঁজে পেয়েছিলেন নিচের চোয়ালের একটি হাড় (একটি দাঁত তখনো সেই চোয়াল থেকে খসে পড়েনি), তারপরে ওপরের চোয়ালের ডান দিকের একটি পেষণ-দাঁত। তারপরে খুলি, তারপরে উরুর একটি হাড়। এছাড়াও হাতী, গণ্ডার, হিপোপটেমাস ইত্যাদি জীবের হাড়গোড়ও পেয়েছিলেন।

মাটির বিশেষ যে স্তর থেকে এগুলো পাওয়া গিয়েছিলো তা থেকে এগুলোর বয়সের একটা আন্দাজ তিনি করেছিলেন। তা হলো, এক লক্ষ থেকে তিন লক্ষ বছর।

জাভা মানুষের যে সব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা খুবই

সামান্য। তবু ও। থেকেই জীব-বিজ্ঞানীরা জাভা মানুষের একটা চেহারা কল্পনা করে নিয়েছেন, না মানুষ, না বানর।

অর্থাৎ মানুষও বানরের বৈশিষ্ট্য এতে সমান ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন ব্রহ্ম তালুটি বানরের মত চ্যাটালো কিন্তু উরুর হাড়টি অবিকল মানুষের মতো।

এই আধাবানর। আধামানুষ জীবটিই হচ্ছে মানুষের পূর্ব-পুরুষ।

নেয়ান ডার্থাল মানুষ

এরপর আবিষ্কৃত হয়েছে নেয়ানডার্থাল মানুষ।

জার্মানীর ডুসেল ডক ও এল্‌বেরফেল্‌ড' এর মাঝখানে অবস্থিত একটি গিরিপথের নাম নেয়ানডার্থাল। এই গিরি-পথের ধারে একটি গুহার মধ্যে থেকে ১৮৫৬ সালে পাওয়া গিয়েছিলো একটি মাথার খুলি। এই খুলির ব্রহ্মতালুটিও বানরের মত চ্যাটাল্যো।

প্রমাণিত হয়েছে, এটি মানুষের কোন পূর্ব-পুরুষের মাথার খুলি। যার বয়স অনুমান হয়েছে ৭৫,০০০ বছর।

১৯০৮ সালের ৩রা আগস্ট তারিখে ফ্রান্সের শাপেন-ও-স্যাঁ নামে একটি গ্রামের কাছে ছোট্ট একটি গুহা থেকে প্রায় আস্ত একটি নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। এটি নেয়ানডার্থাল মানুষের সমকালীন ও সমগোত্রীয়।

এ কঙ্কালটি থেকে নেয়ানডার্থাল মানুষের নিখুঁত একটা বিবরণ পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

মানুষটির প্রকাণ্ড মুণ্ড।

ধড় ছোট।

লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি থেকে পাঁচ ফিট তিন ইঞ্চির মধ্যে।

দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায় বটে কিন্তু শরীর ও মাথা নুয়ে পড়ে সামনের দিকে।

হাঁটু যায় বেঁকে।

দেহের তুলনায় মুখটি বেশ বড়োসড়ো।

মাথার খুলি চ্যাটালো।

অর্থাৎ এ পুরোপুরি মানুষ নয়। আবার বানরও নয়—মাঝামাঝি।

পিকিং মানুষ

১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে মানুষের পূর্ব পুরুষের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় চীনের পিকিং শহরের কাছে।

১৯০২ সালে একজন জার্মান ডাক্তার আবিষ্কার করেন একটি দাঁত। প্রমাণিত হয় এটা কোন মানুষেরই দাঁত এবং হাজার হাজার বছরের পুরানো।

১৯১৬ সালে সুইডেনের একজন জীববিজ্ঞানী পিকিংএর কাছাকাছি একটি অঞ্চলে জন্তু-জানোয়ারের হাড়গোড় খুঁজে পেয়ে খুঁড়তে শুরু করেন। ১৯২৫ সালে কানাডার একজন জীব বিজ্ঞানী যোগ দেন এই দলে।

১৯২৭ সালের ২৬ শে অক্টোবর তারিখে একটি দাঁত আবিষ্কৃত হয়। মাত্র এই একটি আবিষ্কারের ভিত্তিতেই কানাডীয় জীববিজ্ঞানী ডাঃ ব্ল্যাক পিকিং মানুষের কথা ঘোষণা করেন।

পরে এই অঞ্চলে একই বিষয়ে গবেষণা করেছেন একজন চীনা, একজন ফরাসী ও একজন আমেরিকান জীববিজ্ঞানী। পর পর আবিষ্কৃত হয়েছে মাথার খুলি এবং চোয়ালের হাড় ও দাঁত।

পিকিং মানুষের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। মাটির স্তর বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, মানুষটির বয়স অন্ততঃ এক লক্ষ বছর।

চেহারার দিক দিয়ে পিকিং মানুষ ও জাভা মানুষ সমগো-

ত্রীয় এবং সমকালীন।

এরা না মানুষ, না বানর।

দু'য়ের মাঝামাঝি।

পাশাপাশি অঞ্চল থেকে এভাবে একাধিক নিদর্শন পাবার পরে জীববিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এক কালে মানুষের পূর্ব পুরুষদের সমৃদ্ধ বসতি ছিলো।

অষ্ট্রালোপিথেকাস মানুষ

দক্ষিণ আফ্রিকায় মানুষের পূর্ব-পুরুষের প্রথম নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় ১৯২৪ সালে। তারপর ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে।

১৯২৪ সালে দক্ষিণ পশ্চিম ট্রান্সভাল অঞ্চলে একটি কাদা-মাটির ঢিবিকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো। সেই ঢিবির তলায় আরো খানিকটা মাটি খুঁড়ে পাওয়া

গেলো একটি মাথার খুলি। রেমণ্ডডার্ট নামে একজন অধ্যাপক এই খুলিটি পরীক্ষা করে বললেন, এটি একটি ছ'বছর বয়সের বাচ্চার। গড়নের দিক থেকে এটি না-মানুষ, না বানর—ছুয়ের মাঝামাঝি।

তিনি এটির নাম দিলেন অষ্ট্রালেপিথেকাস মানুষ।

১৯৩৬ সালে জোহানেসবার্গ এর কাছাকাছি অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয় আরেকটি মাথার খুলি এবং কিছু হাড়-গোড়। এবারের খুলিটি একজন পূর্ণবয়স্কের। এই জীবটিও না মানুষ, না বানর—ছুয়ের মাঝামাঝি এবং অষ্ট্রালেপিথেকাস মানুষের সমকালীন ও সমগোত্রীয়।

তারপর ছু'বছর পার না হতেই কাছাকাছি অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয় দ্বিতীয় আরেকটি মাথার খুলি এবং কয়েকটি দাঁত। এই জীবটিও অষ্ট্রালেপিথেকাস।

১৯৪৭ সালে একই অঞ্চল থেকে একই ধরনের আরো কয়েকটি নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

মানুষের পূর্ব-পুরুষের নিদর্শন হিসেবে এটি হচ্ছে প্রাচীনতম—এক লক্ষ বছরেরও বেশি বয়স।

মানুষের বিবর্তনের যে ক'টি নিদর্শনের পরিচয় দেয়া হলো সেগুলোকে পর পর সাজালে তিনটি সুস্পষ্ট পর্ব পাওয়া যাচ্ছে।

প্রথমে অষ্ট্রালেপিথেকাস মানুষ।

এক লক্ষ বছরের বেশি বয়স। মানুষের পূর্ব পুরুষের

প্রাচীনতম নিদর্শন। চেহারার দিক থেকে এতো বেশি বুনো যে, এই জীবটিকে বানরের মত দেখতে মানুষ না বলে, মানুষের মত দেখতে বানর বলাই উচিত।

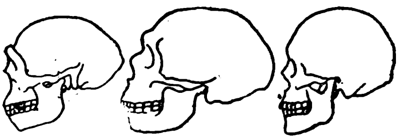
তারপরে জাভা ও পিকিং মানুষ।

এক লক্ষের কাছাকাছি বয়স। চেহারার দিক থেকে বানর ও মানুষের মাঝামাঝি।

এরপর নেয়ানডার্থাল মানুষ।

এর বয়স সত্তর হাজার বছর।

এই জীবটির মধ্যে বানরের চাইতে মানুষের লক্ষণই বেশি।



তিনটি মাথার খুলি। বাঁ দিকে পিকিং মানুষের, মধ্যে নেয়ান-ডার্থাল মানুষের, ডানদিকে আধুনিক মানুষের। গত এক লক্ষ বছরে মানুষের মাথার খুলির গড়ন কতখানি পালটে গেছে তা এই তিনটি ছবি দেখলে বোঝা যাবে।

ক্রো-মাঞঁ মানুষ

বানর থেকে মানুষের বিবর্তনের শেষ পর্বটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ফ্রান্স থেকে।

১৮৬৮ সালে ফ্রান্সের দোদোঞন অঞ্চলে নতুন একটি রাস্তা তৈরি করা হচ্ছিলো। সেখানে চুনাপাথরের স্তূপকে উড়িয়ে দিতে গিয়ে পাওয়া গেলো কয়েকটি হাড়। পরে সেই অঞ্চলের মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে এলো পাঁচটি প্রায় আস্ত নর কঙ্কাল। এদের নাম দেয়া হলো ক্রো মাঞঁ মানুষ।

এদের বয়স ত্রিশ হাজার বছর।

চেহারার দিক থেকে এরা আধুনিক মানুষের সমগোত্রীয়।

ক্রো-মাঞঁ মানুষের রীতিমত লম্বা চওড়া চেহারা।

লম্বায় ৫ ফিট ১১ ইঞ্চি থেকে ৬ ফিট ১ ইঞ্চির মধ্যে।

লম্বাটে মাথা।

থ্যাবড়া মুখ।

পেশীবহুল প্রত্যংগ।

উঁচু চোয়াল।

পুরোপুরি আধুনিক মানুষ। এই মানুষের কল্পিত

ছবি দিয়েই রচিত হয়েছে এ বইয়ের প্রচ্ছদ।

উল্লিখিত প্রমাণাদি আজ মানুষের হাতে মওজুদ রয়েছে। এ থেকে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, জীবজগতের বিকাশ হয়েছে বিবর্তনের ধাপে ধাপে।

এবং এই বিবর্তন সরল থেকে জটিলের দিকে।

দেড়শো কোটি বছর আগে পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে প্রোটোপ্লাজমের কয়েকটি আণুবীক্ষণিক বিন্দুকে আশ্রয় করে প্রাণের যাত্রা শুরু হয়েছিলো। আর আজকের দিনে মানুষের মত জটিল জীব সেই প্রাণের ধারক।

প্রাণের এই বিকাশ হঠাৎ হয়নি।

আচমকা হয়নি।

একটা নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে হয়েছে।

কয়েকটা নির্দিষ্ট ধাপ পেরিয়ে হয়েছে।

জীববিজ্ঞান এই বিবর্তনের ছবিটি এত সুস্পষ্টভাবে এঁকে দিয়েছে এবং এর স্বপক্ষে এমন নির্মম প্রমাণ হাজির করেছে যে, আজ আর বিবর্তনবাদকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানে কল্পনাতীত উন্নতিলাভ করার পর আজ আমাদের তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অবশ্য আমাদের লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই।

সবকিছুই হয়েছে প্রকৃতির তাগিদে।

জীবনের তাগিদে।

বেঁচে থাকার কঠোর প্রয়াস থেকে।

প্রাণের উৎপত্তি থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম আর মরণপণ সংগ্রাম করে বাঁচতে হয়েছে।

ওই বাঁচার তাগিদেই এসেছে নতুন নতুন পথ।

নতুন নতুন দিকে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার প্রয়াস।

অবশ্য প্রাণের পেছনে এই কঠোর পরিশ্রম আর বেঁচে থাকার অধ্যবসায় না থাকলে আজ আর মানুষের মত কোন উন্নত ধরনের জীব নিশ্চয় এই পৃথিবীতে জন্মাতো না। নীচু শ্রেণীর কয়েক প্রকার জীবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হতো।

তাই, শ্রমই মানুষের ভাগ্য বিধাতা।

একে—এই শ্রমকে, প্রতিটি মানুষেরই শ্রদ্ধা জানানো উচিত। এর উপযুক্ত দাম দেয়া উচিত।

গোড়ায় অর্থাৎ মানুষের শৈশবে ছিলো কোন রকমে বাঁচার তাগিদ।

আর আজ চাই আরো উন্নত জীবন।

কিন্তু মূলে সেই একই জিনিস।

সেই তাগিদে মানুষ এগিয়ে যাবেই।

মানুষে মানুষে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

পশু জগৎ থেকে একদিক থেকে একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে যাবে মানুষ।

যে শ্রমের জন্য মানুষ মানুষ হতে পেরেছে তাকেও